সামরিক বাহিনী ও রাজনীতি

সুজিতনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

মোহিত ভট্টাচার্য

ইউনিভার্সিটি লীডারশিপ প্রোগ্রাম

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

নিবেদন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ পরিচালিত ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সহায়তাপুষ্ট 'ইউনিভার্সিটি লীডারশিপ প্রোগ্রাম'-এর প্রকাশনা কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে বর্তমান পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হল। আশা করি তরুণ অধ্যাপক সুজিতনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "সামরিক-বাহিনী ও রাজনীতি" শীর্ষক পুস্তিকাটির বিষয়বস্তু বিশেষভাবে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের সাম্মানিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক ও সাধারণভাবে এবিষয়ে উৎসুক সকলের কাজে লাগবে। বলা বাহুল্য, লেখকের বক্তব্য একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব।

'ইউনিভার্সিটি লীডারশিপ প্রোগ্রাম' পরিচালনার ব্যাপারে এবং বিশেষভাবে প্রকাশনার কাজে উপাচার্য অধ্যাপক ড. সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য, সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক প্রতীপকুমার মুখোপাধ্যায়, সহ-উপাচার্য (অর্থ) অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার সিংহ-এর কাছে যে উৎসাহ ও সাহায্য পেয়েছি সেজন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য পুস্তিকাটির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। প্রেসের কর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এই পুস্তিকাটির দ্রুত প্রকাশন সম্ভবপর হত না। তাঁরা আমাদের ধন্যবাদার্হ। পরিশেষে এই সুযোগে গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ জানাই।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
বিভাগীয় প্রধান ও পরিচালক
ইউনিভার্সিটি লীডারশিপ প্রোগ্রাম

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২৮ আগস্ট ১৯৮৬

ভূমিকা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি আজ এমন ব্যাপক যে এর নির্দিষ্ট গণ্ডী খুঁজে পাওয়া কঠিন এবং অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে বিষয়টি আজ নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে তাত্ত্বিক প্রচেষ্টা। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো, অ্যারিস্টটলের যুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজচর্চার সামগ্রিক প্রচেষ্টার মধ্যে গ্রথিত ছিল। মার্কস ও ওয়েবারের মত শক্তিশালী সমাজবিজ্ঞানীদের চোখেও রাষ্ট্রচিন্তা স্বতন্ত্র, সংকীর্ণ হতে পারেনি। ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সমাজ-পরিবর্তনের চাবিকাঠি খুঁজতে গিয়ে এঁরা অসাধারণ বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় রেখে গেছেন। রাষ্ট্র বা রাজনীতিকে ইতিহাস ও সামাজিক কাঠামো থেকে স্বতন্ত্রভাবে দেখা যায় না, দেখলেও তা হবে বিকৃত ও অবাস্তব চিত্র। তাই মার্কস ও ওয়েবারের মত মনীষীরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সীমারেখাকে একদিকে যেমন ভেঙেছেন অন্যদিকে তেমনি নতুনভাবে গড়েছেন। এরই ফলস্বরূপ বর্তমান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ব্যাপকতা ও তাত্ত্বিক গভীরতা।

এই পুস্তিকাটির বিষয়বস্তু রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সামরিকগোষ্ঠীর সম্পর্ক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে বিবর্তনের কথা বলা হল তারই পরিচায়ক এই ধরনের আলোচনা। রাজনজগতে সামরিক অভ্যুত্থান ও সামরিক গোষ্ঠীর ক্ষমতা দখল যখন প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে ওঠে, তখন স্বভাবতই ভাবতে হয় এই ঘটনার মূলে কি আছে? রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে সম্পর্কসেতু হিসেবে সামরিকগোষ্ঠী দেখা দেয় কি কারণে?

এইসব প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সামরিকবাহিনী একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বেশ কয়েকটি দেশে সামরিকবাহিনী প্রত্যক্ষ শাসকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এই গোষ্ঠী ক্ষমতাসীন। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই গোষ্ঠী রাজনীতিক ক্ষমতার সঙ্গে জড়িত। উন্নত দেশগুলিতেও সামরিকবাহিনীর রাজনীতিক প্রভাব যথেষ্ট। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর চোখে তাই সামরিকগোষ্ঠীর রাজনীতিক ভূমিকা গবেষণার বিষয়বস্তু।

রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ইদানীংকালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাখা হিসেবে রাষ্ট্রিক সমাজতত্ত্ব (Political Sociology) বিষয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত। সামরিকবাহিনীর রাজনৈতিক ভূমিকা অনেকাংশেই এই বিষয়নিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত। শাসক সম্প্রদায় সমাজের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীরই রাজনৈতিক রূপ। সামরিকবাহিনী শাসক হিসেবে অবতীর্ণ হলে স্বভাবতই প্রশ্ন করা যেতে পারে—সমাজের কোন গোষ্ঠীর প্রতিফলন এই বাহিনীতে?

রাষ্ট্রিক বিকাশ (Political Development) নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় সামরিকবাহিনীর ভূমিকা একটি বিতর্কিত বিষয়। আধুনিকতার প্রতীক হিসেবে সামরিকবাহিনীকে দেখার চেষ্টা হয়েছে। আবার বিপরীতধর্মী আলোচনায় বলা হয়েছে সামরিকবাহিনীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসন রাজনৈতিক উন্নয়নের পরিপন্থী।

জটিলতর আলোচনা করা যেতে পারে—বিশেষ একটি দেশে সামরিকবাহিনী শাসক হিসেবে থাকার সামাজিক কোনো কারণ আছে কি? অথবা কোথাও কোথাও বারংবার সামরিক অভ্যুত্থান হয় কেন? সামাজিক কাঠামো এই দেশগুলিতে কি বিশেষ ধরনের? এইরকম প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে সমাজতত্ত্বের আশ্রয় নিতে হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে।

বর্তমানে মার্কসীয় ঘরানার রাষ্ট্রবিজ্ঞানচর্চা তাত্ত্বিক উৎকর্ষসাধনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। ইদানীং সমাজ ও সামরিকবাহিনীর সম্পর্ক নিয়ে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে গবেষণা হচ্ছে। উদারনৈতিক রাষ্ট্রতত্ত্বের পাশাপাশি মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব পরিপূরক বা পরিবর্ত হিসেবে পরিগণিত। সামরিক-বাহিনীর সঙ্গে রাষ্ট্রক্ষমতার সংযোগ একটি জটিল তাত্ত্বিক বিষয়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির পর্যালোচনা বাঞ্ছনীয়।

এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য তাই। লেখক বিষয়টির সব দিক তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। এই বিষয়ে মূল্যবান্ গবেষণার মালমশলা যথাসম্ভব আহরণ করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের কাছে বাংলাভাষায় প্রকাশিত এই পুস্তিকাটি আদৃত হবে বলে আশা করি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২৪ আগস্ট ১৯৮৬

মোহিত ভট্টাচার্য

সামরিকবাহিনী ও রাজনীতি

সামাজিক ও রাজনীতিক পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রচেষ্টা চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীমহলে জনপ্রিয়। ইদানীং নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে রাজনীতিক পরিবর্তনে সামরিকবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে। গবেষণায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত— কখনও উদারনীতিক বা পরম্পরাগত পদ্ধতির ছাপ চোখে পড়ে; কালে-ভদ্রে মার্কসীয় দর্শনের আলোকে আলোচনাও দেখা যায়। রাজনীতিক পরিবর্তনের বিভিন্ন স্বীকৃত ও অস্বীকৃত পদ্ধতি আছে। রাজনীতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজের সকল অংশ সমান ভাবে না হলেও মোটামুটি-ভাবে বৃহৎ অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকে। কিন্তু সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজনীতিক পরিবর্তনের চরিত্র একটু ভিন্ন। সামরিক অভ্যুত্থান কয়েকজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রক্তপাতের মাধ্যমে অথবা কোন কোন সময় বিনা রক্তপাতে সংঘটিত হতে পারে।

সাধারণত দেখা যায় যে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিক ব্যবস্থা, এমন একটা সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তোলে, যার ফলে সমাজের

এক অংশ তার মূল্যবোধ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে দেখতে পায় ; আর অন্য অংশ, যারা বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত, তারা রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতাবস্থা বজায় রেখে শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তনকেই সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম পদ্ধতি হিসাবে মেনে নেয়। এক কথায় একটি সর্বস্বীকৃত পদ্ধতির মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তনকেই রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তন হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে এই ধরনের সাধারণ মূল্যবোধের প্রভাব ইদানীং কমে আসছে। এবং সেখানে অস্বীকৃত উপায়ে তড়িৎ রাজনৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সামাজিক ও আর্থনীতিক উন্নয়নের এক কৃত্রিম চেষ্টা করা হচ্ছে। রাজনৈতিক শাসকগোষ্ঠীর দুর্বলতা বা অন্তর্নিহিত কলহের সুযোগে সামরিকবাহিনীর প্রধানরা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নিচ্ছে। অথবা অনেক ক্ষেত্রে বিনা আয়াসে চলে যাচ্ছে।

অনেক সময় দেখা যায় যে, নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলো, তাদের স্বাধীন রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে বিদেশী ভাবধারা ও শিক্ষার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। এই বিদেশী ভাবধারাকে কেন্দ্র করেই সামাজিক আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াকে সচল রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় পশ্চাৎপদ সমাজের সঙ্গে আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটা পার্থক্য থেকেই যায়, তার জন্যে অতি সহজেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার আধুনিক নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোর সাহায্যে সমাজের ওপর এমন ভাবে প্রভাব বিস্তার করে যে ক্রমান্বয়ে সমাজ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ওপর সব ব্যাপারে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এরকম অবস্থায় যখন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলো কোন বিশেষ কারণে বা অবস্থায় রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর তাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করার সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলতে পারে, তখনই যে কোন একটি সুযোগ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সামরিকবাহিনী অভ্যুত্থানের দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নেয়। এই ধরনের ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে সামরিকবাহিনীর গুরুত্ব বেশী, তার কারণ, সমস্ত নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার মধ্যে সামরিকবাহিনী-ই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সু-সংগঠিত। সুতরাং এদিক থেকে সামরিকবাহিনীর ক্ষমতা দখল করার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। এর কারণ আমরা পরে আলোচনা করব।

রাজনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সামরিকবাহিনীর গুরুত্ব গবেষকদের কাছে বিশেষভাবে স্বীকৃত। অনুন্নত ও নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে দেখা

যায় সামরিকবাহিনীর সদস্যগণ শুধু বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তই নন, উপরন্তু আধুনিক মনন ও মূল্যবোধসম্পন্নও। সামরিকবাহিনীর সদস্যরূপে মনোনীত হওয়ার পরই, প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে, তাদের নিয়ে এমন এক পরিমণ্ডল সৃষ্টির প্রয়াস করা হয়, যা একদিকে যেমন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন, অন্যদিকে বৃহত্তর পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের নৈর্ব্যক্তিক আধুনিক সমরকৌশলের সঙ্গেও পরিচিত করানো হয়। ফলে তাদের মধ্যে এক আধুনিক শৃঙ্খলাবদ্ধ মানসিকতা প্রসারিত হতে থাকে। এছাড়াও সামরিকবাহিনীর সদস্যগণ তাদের কার্যগত কারণে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে বিশেষত উন্নত দেশের সঙ্গে দ্রুত পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। অনেক অনুন্নত বা নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে দ্রুত সামাজিক বিকাশের জন্য সামরিকবাহিনীর সদস্যদের প্রত্যক্ষ সাহায্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তাদের উন্নত কারিগরী শিক্ষাকে সমাজ নির্মাণে ব্যবহার করা হয়। যেমন ব্রাজিলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য সামরিকবাহিনীর সদস্যদের নিয়োগ করা হয়। অনেক দেশে সামরিকবাহিনীর সদস্যদের সরাসরি রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদান করা না হলেও সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা হয়।[১]

সামরিকবাহিনীর বৈশিষ্ট্যই বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সামাজিক গোষ্ঠীসমূহ থেকে তাকে পৃথক করে রেখেছে। যেমন প্রথমত যে কোন দেশের সামরিক-বাহিনীকে অপরাপর দেশের সামরিকবাহিনীর সমকক্ষ করে তোলার চেষ্টা করা হয়। তাই আন্তর্জাতিক যুদ্ধকৌশলের উপযোগী করে তাকে গড়ে তোলা হয়। দ্বিতীয়ত, বিশেষত অনুন্নত ও নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ-গুলোতে সামরিকবাহিনীর অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে দেশের সংকটাবস্থার মোকাবিলা করা। এমন কি অনেক দেশে সামরিকবাহিনীর প্রধানদের হাতে দেশের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারও অর্পণ করা হয়। তৃতীয়ত, সামাজিক গোষ্ঠী-সমূহ থেকে দূরত্বে থাকার ফলে এবং কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য সামরিকগোষ্ঠীর মধ্যে এক ভিন্ন ধরনের আধুনিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। ফলে সামরিকবাহিনীর সদস্যগণ অনেক সময় নিজেদের আধুনিকতার ধারক বলে মনে করেন।[২] এ সমস্ত কারণে, সামরিকবাহিনী নিজেদের আধুনিকী-করণের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি অন্যান্য সামাজিকগোষ্ঠীর মতো স্বচ্ছন্দে যুক্ত হতে না পেরে (আবার অনেক সময় যুক্ত হয়েও) সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করে।

ইদানীং বিশেষ করে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায়, মধ্যপ্রাচ্যে, আফ্রিকা মহাদেশের রাষ্ট্রসমূহে, এশিয়াতে এবং বহু ইওরোপীয় দেশসমূহে সামরিক অভ্যুত্থান স্বাভাবিক ও প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে। গত 1945 সাল থেকে 1970 সাল পর্যন্ত আফ্রিকা মহাদেশে সংঘটিত আভ্যন্তরিক সংঘর্ষের প্রায় 71 শতাংশ সামরিক অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত। ঠিক একই ভাবে এশিয়া মহাদেশের 42 শতাংশ, ল্যাটিন আমেরিকা দেশসমূহের 52 শতাংশ, মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার 75 শতাংশ এবং ইওরোপের 3 শতাংশ সামরিক অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত।[৩] Fred R vonder Mehden[৪] -এর তথ্যানুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে 75টি রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করেছিল তার মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দেশ ইতোমধ্যেই সামরিক অভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। Mehden-এর মতে আধুনিক কালে সামরিক অভ্যুত্থানের অন্যতম কারণ রাজনীতিক ব্যবস্থায় স্থিতাবস্থা প্রদান কিংবা রাজনীতিক বিরোধিতাকে সমূলে বিনষ্ট করা।

অনুন্নত ও নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রসমূহে তুলনামূলকভাবে সামরিক-বাহিনী একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুসংগঠিত গোষ্ঠী। এবং অনুন্নত দেশে আধুনিকীকরণের সম্ভাব্য মাধ্যম হওয়ার শক্তিও এর মধ্যে নিহিত। সামরিক-বাহিনীর সদস্যদের বিশেষ প্রশিক্ষণের সাহায্যে এমনভাবে নিয়মানুবর্তী করে তোলা হয় যে তারা সামাজিকগোষ্ঠীসমূহ থেকে অনেক ব্যাপারে তৎপর ও সক্রিয় হয়। সামরিকবাহিনীর কাঠামো স্তরের সুপরিকল্পিত বিন্যাসের জন্য যে কোন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব তার ব্যক্তিগত প্রভাব অপেক্ষা তার পদের গুরুত্ব অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়।

যে কোন ব্যবস্থাই সামরিকবাহিনীকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে চায়। এবং রাজনীতিক ব্যবস্থায় সামরিকবাহিনীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে প্রচলিতভাবে একটি অস্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সামরিক ও সামাজিক গোষ্ঠীর পারস্পরিক ক্ষমতার ভিত্তিতেই এই দুটি গোষ্ঠীর মধ্যের সম্পর্কটি বিবেচিত হয়ে থাকে। সামাজিক-গোষ্ঠী অর্থে, বর্তমান প্রসঙ্গে অসামরিক সরকারী ব্যবস্থার কথাই উল্লেখ করা হচ্ছে।

উন্নয়নশীল দেশে সামাজিক রাজনীতিক পরিবর্তন একদিকে যেমন আভ্যন্তরিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত, তেমনিই এর সঙ্গে বাহ্যিক পরিবেশের যোগসূত্র আছে। বিশেষত উন্নয়নশীল বা অনুন্নত

দেশগুলি বাহ্যিক পরিবেশের প্রভাবের দ্বারা ব্যাপকভাবে নির্ধারিত হয়। এবং আভ্যন্তরিক ক্ষেত্রে যে চাপ বাহ্যিক পরিবেশ থেকে আসে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে বহু সময় অসামরিক সরকারকে সামরিকবাহিনীর প্রধানদের প্রত্যক্ষ সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। আর অবস্থার তারতম্য অনুসারে সামরিকবাহিনীর সঙ্গে অসামরিকবাহিনীর সম্পর্কও নির্ধারিত হয়। তাই Morris Janowitz-এর মতে, সামরিক ও অসামরিকবাহিনীর মধ্যে সম্পর্ক কি রকম হবে, এই প্রশ্নটা যত না বেশী তাত্ত্বিক তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে নির্দিষ্ট ঘটনা বা অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।[৫] সুতরাং এদিক থেকে দেখতে গেলে বিভিন্ন দেশের সামরিকবাহিনীর অভ্যুত্থান বা অসামরিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের ঘটনাকে, কোন একটি তাত্ত্বিক চৌহদ্দির মধ্যে থেকে বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর নয়। বরঞ্চ নির্দিষ্ট সময় ও অবস্থার ঘটনানুসারে বিশ্লেষণ অথবা বোঝার চেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত।

S. P. Huntington[৬] সামরিক ও অসামরিক সম্পর্ককে বৃহত্তরভাবে দুটো ভাগে ভাগ করেছেন। S. P. Huntington-এর প্রতিরূপ নিম্নরূপ :

সামরিক ও অসামরিকগোষ্ঠী

- সামরিক-অসামরিক সম্পর্ক
  - ১. সমগ্র সামরিকবাহিনীর সঙ্গে সমগ্র সমাজের সম্পর্ক
  - ২. কেবল সামরিকবাহিনীর উচ্চপদস্থ সচিব ও সমাজের এলিটদের মধ্যে সম্পর্ক
  - ৩. কেবল উচ্চপদস্থ সামরিক সচিব ও সরকারী নেতৃবর্গের মধ্যে সম্পর্ক।
- সামরিকবাহিনীর ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ
  - বিষয়ীকৃত নিয়ন্ত্রণ প্রতিরূপ (Subjective Control Model)
  - নৈর্ব্যক্তিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিরূপ (Objective Control Model)
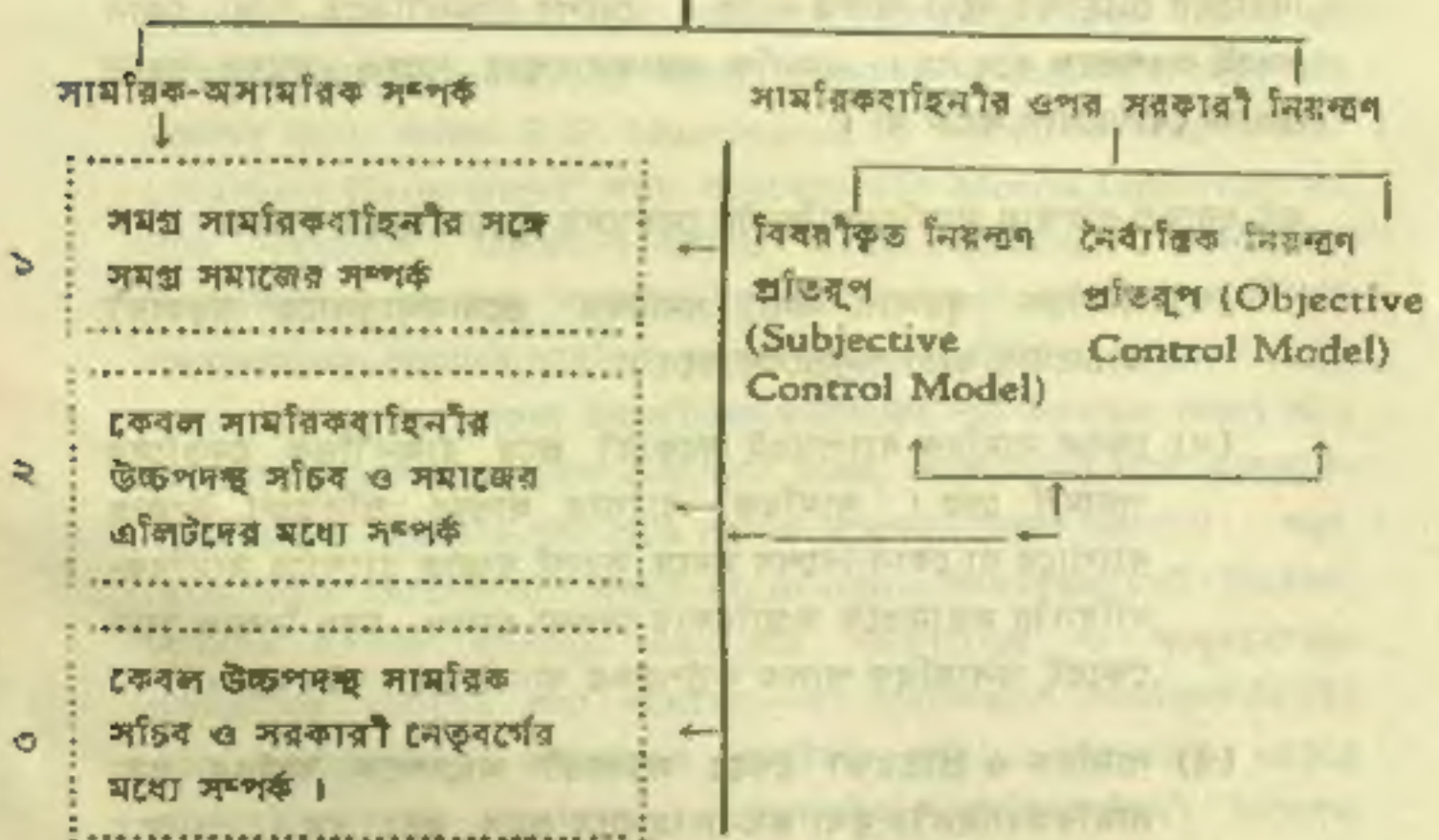
বিষয়ীকৃত নিয়ন্ত্রণ প্রতিরূপ (Subjective Control Model) : এই ক্ষেত্রে সামরিক ও অসামরিকগোষ্ঠীর মধ্যেকার পার্থক্যটা সুস্পষ্ট নয়। এমন কি এই দুই গোষ্ঠীর পারস্পরিক সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও সাযুজ্য বর্তমান। সামরিকগোষ্ঠী মূলত বৃহত্তর সমাজের এক অবিভাজ্য অংশ হিসাবে অবস্থান করে। তারা সরাসরি রাজনীতিক ক্ষেত্রে ও অন্যান্য সামাজিক সিদ্ধান্ত গঠনে অংশগ্রহণ করে, এবং সামরিকবাহিনীকে সমাজ বিচ্ছিন্ন অংশ হিসাবে সামরিক নিবাসে আবদ্ধ করে রাখা হয় না। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার দায়িত্ব শুধু সামরিকবাহিনীর ওপর অর্পণ করার পরিবর্তে দেশের প্রতিটি নাগরিক প্রয়োজনে নিজেকে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকে। করপ্রদান, রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলা ইত্যাদির ন্যায় সার্বভৌমত্ব রক্ষার কাজে যুক্ত হওয়া প্রতিটি নাগরিক কর্তব্য বলে মনে করে।

নৈর্ব্যক্তিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিরূপ (Objective Control Model) : এই ব্যবস্থায় সামরিক ও অসামরিকগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট থাকে। সামরিকবাহিনী, তার সচিববৃন্দ ও নেতৃবৃন্দ তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ, ভূমিকা ও কার্যপদ্ধতিসহ পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে সামরিক নিবাসের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। দেশের রাজনীতিতে তারা কোন সময়ই অংশগ্রহণ করে না। এমনকি সমাজব্যবস্থার সঙ্গেও তাদের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না।

এই ধরনের ব্যবস্থায় সামরিকবাহিনীর নেতাদের মূলত তিনটে কাজ :

(ক) সামরিক সুরক্ষার জন্য সমাজের প্রয়োজনানুসারে সরকারী কাঠামোয় তারা অনুপ্রবেশ করে।

(খ) কেবল সামরিক ব্যাপারেই সরকারী স্তরে রাজনীতিক নেতাদের পরামর্শ দেয়। সামরিক ব্যাপার ছাড়াও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে বা কোন বিশেষ সময়ে স্বরাষ্ট্র সংক্রান্ত ব্যাপারে সামরিক-বাহিনীর মতামতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলেও, চরম সিদ্ধান্ত দুটো ক্ষেত্রেই অসামরিক শাসক কর্তৃপক্ষের দ্বারাই গ্রহণ করা হয়।

(গ) সামরিক ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সরকারী আদেশকে কার্যকর করা সামরিকবাহিনীর মুখ্য কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। প্রসঙ্গত

সামরিকবাহিনীর উচ্চপদস্থ সচিববৃন্দ সিদ্ধান্ত কার্যকর করার কৌশল সংক্রান্ত পরামর্শ দিলেও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মতামত দিতে পারে না।

নৈর্ব্যক্তিক নিয়ন্ত্রণানুসারে সামরিকবাহিনীকে এক ভিন্ন ধরনের মূল্যবোধের ভিত্তিতে গঠন করা হয়। সামাজিক মূল্যবোধ অথবা রাজনৈতিক মতাদর্শ থেকে তারা বৃহত্তর অর্থে বিচ্ছিন্ন থাকে। সামরিক-বাহিনী অসামরিক সিদ্ধান্তকে কার্যে পরিণত করে, কারণ তা তারা কর্তব্য বলে মনে করে—মূল্যবোধগত সাযুজ্য হেতু তারা তা করে না। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করাকে তারা তাদের পেশাগত কর্তব্য বলে মনে করে, এমনকি বহু ক্ষেত্রে বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে সামরিক সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত থাকে বটে, কিন্তু যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে তারা অনেক সময় অজ্ঞ থাকে।

এইভাবেই সামরিকবাহিনীর মধ্যে পেশাদারী মনোভাব চালু করে S. P. Huntington' বা Bengt Abrahamsson" সামরিকবাহিনীকে রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ করে রাখার চেষ্টা করেছেন। যদিও Bengt Abrahamsson স্পষ্টতই মনে করেন যে শিল্পোন্নত দেশেই কেবল এই পেশাদারী মনোভাব চালু করা সম্ভবপর। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে এটা সম্ভবপর নয়। এছাড়া S. P Huntington যে 'রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার' (Political Neutrality) কথা বলেছেন, তাও Morris Janowitz* এর মতে বহুলাংশে অবাস্তব—বিশেষত Huntington-এর 'রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা' কথাটার ব্যবহার সুপ্রযুক্ত হয়নি। কারণ উদারনৈতিক গণতন্ত্রের তত্ত্ব অনুসারে সামরিক পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিরপেক্ষ হতে হবে—অর্থাৎ তারা কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের পক্ষ অবলম্বন করবে না। কিন্তু রাজনৈতিক ধারার সঙ্গে এবং তার নিয়ম, অনুশাসনের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত থাকবে ও তার প্রতি সার্বিক আনুগত্য প্রকাশ করবে।" তবে 'রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা' বলতে Huntington সামরিকবাহিনী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ব্যাপারে এমন এক সমভাবাপন্ন ও সাযুজ্যসম্পন্ন মূল্যবোধের প্রসারের কথা বলেছেন—যা পরোক্ষভাবে সামরিকবাহিনীর মধ্যে মূল্যবোধগত সমানতাকে প্রসারিত করে। তবে এই ধরনের সম-মূল্যবোধসম্পন্ন পেশাদার ও রক্ষণশীল সামরিকবাহিনী বিশেষত

উন্নয়নশীল দেশে কতখানি গঠন করা সম্ভবপর, সে ব্যাপারে চিন্তার অবকাশ আছে।[১১]

সাধারণত দেখা যায় যখন অসামরিকগোষ্ঠী সামরিকবাহিনীর স্বার্থরক্ষার্থে অপারগ হয় অথবা নৈর্ব্যক্তিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ভেঙে পড়ে, তখন সামরিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ সামাজিকগোষ্ঠীর পরিচালন অক্ষমতা প্রকট হয়ে উঠলে আধুনিকতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সামরিকবাহিনীর মধ্যে অসামরিক ক্ষমতা দখলের প্রবণতা প্রবল হয়ে ওঠে। বিশেষত অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা বহুলাংশে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নির্ধারিত হয়। সুতরাং রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত সঙ্কট বা বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত, সামরিকবাহিনীকে প্রভাবিত করে, ও তার চরিত্র নির্দিষ্ট করে।[১২]

প্রচলিত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অনুসারে, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দেশসমূহের ব্যবস্থা অনুসারে সামাজিকগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন সামরিকবাহিনীকে শাসকবর্গ সংরক্ষিত শক্তি হিসাবে ব্যবহার করে। সামরিকবাহিনীর চাহিদা বা অসন্তোষকে কোনভাবেই সমাজের বৃহত্তর চাহিদার সঙ্গে একাত্মকরণ করতে দেওয়া হয় না। উন্নত উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দেশসমূহে সামরিকবাহিনী কোন কোন নীতি নির্ধারণে সীমিত ও প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করলেও মূল নিয়ন্ত্রণক্ষমতা অসামরিকগোষ্ঠীর হাতেই থাকে। সামরিকবাহিনী বিশেষ করে বিদেশী নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে, প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে এবং নিজেদের সুযোগ-সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে তৎপর থাকে। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রবণতা তাদের মধ্যে অত্যন্ত কম। এমনকি আমেরিকা, ব্রিটেন, কানাডা ইত্যাদি উন্নত দেশসমূহের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অনেক দেশেই অতীতে সামরিকবাহিনীনির্ভর রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকলেও, পরবর্তীকালে সামরিকবাহিনী অসামরিকগোষ্ঠীর কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে মেনে নেয়।

সামরিকবাহিনীর সঙ্গে সামাজিকগোষ্ঠীর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করার আগে, অনুন্নত এবং নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর সামরিকবাহিনীর বৈশিষ্ট্য স্বল্পপরিসরে পর্যালোচনা করে নেওয়া প্রয়োজন। কারণ এই সমস্ত দেশে সামরিকবাহিনীকে ক্রমাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে নিতে দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত বিশেষত অনুন্নত ও নব

স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে সামরিকবাহিনীর সঙ্গে অসামরিক তথা সামাজিক গোষ্ঠীর পার্থক্যও স্পষ্ট। এবং তৃতীয়ত, ইদানীং এই সমস্ত দেশে সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনা হামেশাই ঘটছে।

তাছাড়া শিল্পোন্নত দেশের রাজনীতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সামরিকবাহিনীর ভূমিকা ও উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশের সামরিকবাহিনীর ভূমিকাকে একই পর্যায়ে ফেলে তুলনা করা ঠিক হবে না। উদারনীতিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিবূপের ভিত্তি সামরিকবাহিনীকে শুধু একটি শক্তিশালীগোষ্ঠী হিসাবে যদি বিবেচনা করা হয়, যা S. P Huntington প্রমুখ করেছেন, তবে অনুন্নত দেশের বা উন্নয়নশীল দেশের সামরিক-বাহিনীর বৈশিষ্ট্য ঠিকমতো বোঝা যাবে না। কারণ একথা বহুলাংশে সত্য যে উন্নয়নশীল দেশগুলো বিশেষত 1945 সালের পর যে সমস্ত সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার জন্য দায়ী অসামরিক-গোষ্ঠীর শাসনপরিচালনায় অক্ষমতা অথবা অসামরিক এলিটদের মধ্যে অন্তর্কলহ। যে কোন দেশেই—তা সে উন্নয়নশীল, অনুন্নত বা শিল্পোন্নত যাই হোক না কেন—সামরিকবাহিনীর ভূমিকা ও বৈশিষ্ট্য রাজনীতির সঙ্গে তার ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়।[১৮]

অনুন্নত ও নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে সামরিকবাহিনী সাধারণভাবে সর্বাপেক্ষা আধুনিকগোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত। Lucian W Pye[১৯] মনে করেন সর্বাপেক্ষা আধুনিকগোষ্ঠী হিসাবে রাজনীতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় সামরিকবাহিনীর ভূমিকা কি হবে, তা বহুলাংশে নির্ভর করে সামরিকবাহিনীর সদস্যদের মূল্যবোধের ওপর। সামরিক-বাহিনী তার মূল্যবোধের ভিত্তিতে নিরপেক্ষ বা পেশাদারী মনোভাবাপন্ন হতে পারে।

নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সামরিকবাহিনী প্রধানত শিল্পোন্নত দেশগুলোর অনুকরণে এবং দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। ফলে একদিকে যেমন তারা আধুনিক বৈজ্ঞানিক সামরিক প্রকরণসমূহের দ্বারা সজ্জিত, অন্যদিকে তেমনি পাশ্চাত্যের সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের মূল্যবোধগত পার্থক্যও বিস্তর। যে সব দেশে সামরিকবাহিনীর সদস্যরা মূলত নিরপেক্ষ, সেখানে সামরিকবাহিনী রাজনীতিক ব্যবস্থা থেকে দূরত্ব বজায় রেখে, একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু নিরপেক্ষ আর পেশাদারী মনোভাব যে সব সময়

একধর্মী মূল্যবোধ গড়ে তুলবে, তার কোন মানে নেই। যদিও S. P. Huntington-এর মতানুসারে এই দুটোর মধ্যে একটা নিশ্চিত সম্পর্ক রয়েছে। অনেক সময় পেশাদারী মনোবৃত্তির প্রসার সামরিকবাহিনীকে ক্ষমতা দখলে প্রবৃত্ত করতে পারে। এবং ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে সামরিক প্রধানগণ সমাজ থেকে চিরাচরিত মূল বোধের অবসান ঘটাতে ও আধুনিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত সামরিক-বাহিনী রাজনীতিক ব্যবস্থার এক সক্রিয় গোষ্ঠী হিসাবে যুক্ত থাকে।

সামরিকবাহিনীকে অসামরিক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার চেষ্টা প্রধানত পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোতে করা হয়। এই নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার বিষয়ীকৃত প্রতিরূপ অনুসারে, সামরিকবাহিনীকে সমাজ বিচ্ছিন্ন করে রাখার পরিবর্তে, বহু সামাজিক ও সরকারী ক্ষেত্রে সামরিক সচিবদের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়। রাজনীতিক নেতৃবর্গের সঙ্গে সামরিক সচিবদের এক গভীর যোগাযোগ থাকে। ফলে সরকারী ও সামরিক গোষ্ঠীর উচ্চস্তরে কোন মূল্যবোধগত পার্থক্য থাকে না। নৈর্বক্তিক প্রতিরূপের ক্ষেত্রে সামরিক ও অসামরিক সদস্যদের মধ্যে সহজ সম্পর্ক থাকে না। এই ধরনের ব্যবস্থায় সামরিক সচিবদের কাজ প্রধানত :

(১) সরকারী কাঠামোতে সামরিকবাহিনীর স্বার্থ উপস্থিত করা এবং স্বার্থসাধনের চেষ্টা করা ;

(২) সামরিক নীতিসংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারকে প্রয়োজন মতো পরামর্শ দেওয়া ;

(৩) সামরিক ক্ষেত্রে সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করা। এ ধরনের ব্যবস্থায় সামরিকবাহিনী সামাজিক ও রাজনীতিক মতাদর্শ সম্পর্কে উদাসীন থাকে। সামরিকবাহিনী সরকারী নির্দেশ পেশাদারী দায়িত্ব হিসাবে প্রতিপালন করে।

S. P. Huntington[১১]-এর মতে বিষয়ীকৃত প্রতিরূপ অনুসারে সামরিক-বাহিনী সমাজের প্রতিফলন স্বরূপ, আর নৈর্বক্তিক প্রতিরূপ অনুসারে সামরিকবাহিনী শুধুই প্রতিরক্ষার যন্ত্র বিশেষ। সুতরাং একটি ব্যবস্থায় সামরিকবাহিনীকে সামাজিক ব্যাপারে নিরপেক্ষ করে রাখা হয়, এবং রাজনীতি থেকে দূরে রাখা হয়, আবার অন্য ব্যবস্থায় সামরিকবাহিনীকে সমাজের অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গ্রহণ করে তাকে রাজনীতিক ব্যবস্থার

অঙ্গীভূত করে নেওয়া হয়। এই দুটো বিকল্পর মধ্যে কোন্‌টা গ্রহণযোগ্য—তা নির্ভর করে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক মূল্যবোধের ওপর।

সামরিক ও অসামরিকগোষ্ঠীর সম্পর্কের ধারা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। তবে যেখানে সমাজের মোটামুটি নীচের স্তর অবধি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে, সেখানে সামরিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম।* এসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ সামরিকবাহিনীর প্রভাব বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে বা প্রতিরক্ষার ব্যাপারে দেখতে পাওয়া যায়। Janowitz তিনটি প্রতিরূপের সাহায্যে সামরিক-অসামরিক সম্পর্ককে পর্যালোচনা করেছেন :

(১) অভিজাততান্ত্রিক (২) গণতান্ত্রিক (৩) একক্ষেন্দ্রিক।

শিল্প বিপ্লবের আগে সাধারণভাবে পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলোতে এই ধরনের সামরিক-অসামরিক সম্পর্ক দেখা যেত। সমাজের উচ্চবংশীয়রা তাদের আভিজাত্যের অন্যতম সূচক হিসাবে রাজনীতিতে অথবা সামরিক-বাহিনীর উচ্চপদ গ্রহণ করত, এমনকি অনেক অভিজাত পরিবারের এক সন্তান সামরিকবাহিনীতে যোগ দিত অন্য সন্তান রাজনীতিতে। এসব কারণে রাজনৈতিক নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে সামরিকবাহিনীর প্রধানদের কোন মূল্যবোধগত বা মতাদর্শগত পার্থক্য ছিল না। S. P. Huntington একেই বিষয়ীকৃত নিয়ন্ত্রণ প্রতিরূপ (Subjective Control Model) হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

গণতান্ত্রিক প্রতিরূপের ক্ষেত্রে সামরিকবাহিনী ও অসামরিকগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সামরিকবাহিনীকে বিধিবদ্ধ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয় তবে এই ধরনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা জরুরী হল এক শক্তিশালী গণতান্ত্রিক সরকারী কাঠামো গড়ে তোলা, যা একদিকে যেমন সমাজে এক বিশেষ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রসারে সচেষ্ট থাকবে, অন্যদিকে তেমনি সামরিকবাহিনীর সদস্যদের মধ্যেও এক নৈর্ব্যক্তিক মূল্যবোধ গড়ে তুলবে। বিধিবদ্ধ আইন সামরিকবাহিনীর ব্যবহারকে নির্দিষ্ট করে দেবে। সামরিক সচিবরা পেশার ভিত্তিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকবে। সুতরাং সচিবগণ সরকারের আদেশ কর্তব্য হিসাবে মেনে চলবে এবং পেশাদার হিসাবে যুদ্ধ করবে।

এবার

গণতান্ত্রিক প্রতিরূপের কোন স্পষ্ট ঐতিহাসিক উদাহরণ নেই। বরঞ্চ এটাকে আমরা নৈর্ব্যক্তিক রাজনৈতিক নীতি হিসাবে দেখতে পারি। আধুনিক কালে গণতান্ত্রিক প্রতিরূপ কিছু কিছু শিল্পোন্নত পশ্চিমের দেশে দেখতে পাওয়া যায়, বিশেষত যেখানে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ছাড়াও, রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি সমাজের সার্বিক আনুগত্যও এই প্রতিরূপকে বাস্তবায়িত করার জন্য জরুরী।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অতীতের অভিজাততান্ত্রিক প্রতিরূপ, ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মাধ্যমে, গণতান্ত্রিক প্রতিরূপে পরিবর্তিত হওয়ার পরিবর্তে সামগ্রিকতাবাদী প্রতিরূপে পর্যবসিত হয়ে পড়ে।[৩] এই ব্যবস্থায় সামরিকবাহিনীকে একদলীয় কেন্দ্রীভূত শাসনক্ষমতার সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। শাসকগোষ্ঠী সমগ্র ক্ষমতার কেন্দ্রীভূত উৎস হিসাবে অতি সহজেই সামরিকবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

সামগ্রিকতাবাদী প্রতিরূপ যেভাবে জার্মানী বা ইতালীতে গড়ে উঠেছিল, তাকে আমরা বহুলাংশে বিষয়ীকৃত নিয়ন্ত্রণ প্রতিরূপের আধুনিকতম রূপ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। তবে এই বিষয়ীকৃত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কোন অবস্থাতেই সামরিক ও অসামরিক এলিটদের পারস্পরিক বোঝাপড়া বা মূল্যবোধগত সাযুজ্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না। বরঞ্চ শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ বা ক্ষমতাগত দ্বন্দ্ব থেকেই এক শ্রেণীর সামরিক সচিব তাৎক্ষণিক সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করে, এবং সেভাবেই ক্ষমতা দখল করে তার সামরিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। বিশেষত রাষ্ট্রব্যবস্থার এক সংকটাবস্থায় এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে দেখা যায়।

নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর সামরিক-অসামরিক গোষ্ঠীর সম্পর্ক উপরিউক্ত প্রতিরূপ অনুসারে ব্যাখ্যা করা যায় না। এইসব দেশ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংগঠিত না হওয়ার ফলে, আধুনিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সামরিকবাহিনীকে সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যাপারে অনেক বেশী সক্রিয় হয়ে উঠতে দেখা যায়।

Janowitz নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর সামরিক ও সামাজিক-গোষ্ঠীর সম্পর্ককে পাঁচটি প্রতিরূপের সাহায্যে আলোচনা করেছেন :

(১) অভিজাততান্ত্রিক ব্যক্তিনির্ভর সম্পর্ক ;

(২) অভিজাততান্ত্রিক দলনির্ভর সম্পর্ক ;

(৩) গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতামূলক এবং আধা-প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্ক ;

(৪) সামাজিক ও সামরিকগোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতামূলক সম্পর্ক ,

(৫) সামরিকবাহিনীর স্বৈরাচারিতা ।

প্রথম তিনটে ক্ষেত্রে সামরিকবাহিনী সুনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় সামাজিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে । অভিজাততান্ত্রিক ব্যক্তিনির্ভর সম্পর্কে সামরিকবাহিনীকে সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসাবে দেখা হলেও, রাজনীতিক ক্ষেত্রে তার কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে না । অভিজাততান্ত্রিক দলনির্ভর ব্যবস্থায় সংসদীয় প্রাধান্য সমগ্র রাজনীতিক ব্যবস্থার ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, এবং সামরিকবাহিনীর প্রায় সমান্তরালভাবে আধা সামরিকবাহিনী ও পুলিশবাহিনীকে গড়ে তোলা হয় । অপরদিকে গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থায় ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার সুস্পষ্ট প্রভাবের ফলশ্রুতিস্বরূপ সামরিকবাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত ও বিচ্ছিন্ন শক্তি হিসাবে সামাজিক ও রাজনীতিক ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা থেকে দূরে রাখা হয় ।

ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি বহু দেশে দেখা যায় সামাজিকগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ সামরিক সহায়তায় রাজনীতিক ক্ষমতায় টিকে আছে, এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যই সমাজের রাজনীতিকগোষ্ঠীকে সামরিকবাহিনীর সঙ্গে সমঝোতা করে চলতে হয় । পাকিস্তানেও প্রাথমিক পর্বে এই ধরনের সমঝোতা গড়ে উঠেছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে সামরিকবাহিনী সামাজিক-গোষ্ঠীর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়, এবং 'সামরিক স্বৈরাচার' প্রতিষ্ঠা করে । থাইল্যান্ড, ঈজিপ্ট, সুদানের ন্যায় বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য ।

তবে একথা অনেকে মনে করেন যে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে আধুনিকীকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সামরিকবাহিনী ক্ষমতা দখল করলেও, অনেক ক্ষেত্রেই তারা সেই প্রতিশ্রুতি রাখতে পারে না । এর কারণ ক্ষমতা দখলের পর সামরিকবাহিনী উপরিস্তরে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠা করলেও সমাজের নিম্নস্তরের স্বাভাবিক আনুগত্য তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে লাভ করে না । তাছাড়া সুনির্দিষ্ট উন্নতিমূলক পরিকল্পনার অভাবও তাদের মধ্যে দেখা যায় । ইদানীং দেখা যাচ্ছে, যে সব দেশে সামরিক-

তের

বাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে সেখানে তারা নির্বাচনের মাধ্যমে সেই ক্ষমতার সামাজিক স্বীকৃতির ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার চেষ্টা করছে।

আবার ক্ষেত্র বিশেষে এও দেখা যাচ্ছে যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সামরিক নেতাগণ অনেক সময় শিল্পোন্নত বা সামরিক জোটের নেতৃস্থানীয় উন্নত দেশের চাপে পড়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ তাদের ক্রমবর্ধিত আর্থনীতিক নির্ভরশীলতা বিশেষভাবে তাদেরকে উন্নত দেশের বিরুদ্ধাচরণ করতে দিচ্ছে না। তাই গণতান্ত্রিক আবরণ বিশ্ববাসীকে দেখানোর জন্য নির্বাচনের প্রহসন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, কিন্তু সামরিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে এই নির্বাচনের ফলাফলকে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে সামরিক ও সামাজিকগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক কিরকম হবে তা বহুলাংশে নির্ভর করে প্রতিটি দেশের আর্থ-সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ইতিহাসের ওপর। যার ভিত্তিতে উপরিউক্ত পাঁচটি প্রতিরূপ নির্ণয় করা হয়েছে। সাধারণত নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে রাজনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সামরিকবাহিনীর ভূমিকা ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের নিরিখে নির্ধারিত হয়। যেমন কোন কোন দেশে সামরিকবাহিনীকে রাষ্ট্রীয় গোলযোগ বা হিংসাত্মক ঘটনা দমনে ব্যবহার করা হয়, এবং সেক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে সামরিকবাহিনীর একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে। এছাড়াও নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহে সমাজের একটা বিশেষ শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে সামরিক সচিবদের নিয়োগ করা হয়। এবং তাদেরকে আধুনিক প্রশিক্ষণের দ্বারা পেশাগত ভাবে যোগ্য ব্যক্তি হিসাবে গঠন করা হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মূলত জাতীয় মূল্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতিক শাসকদের মূল্যবোধের সঙ্গে তাদের মূল্যবোধের কোন পার্থক্য থাকে না। অন্যদিকে সামরিকবাহিনীর নিম্নতন সদস্যদের সমাজের মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত শ্রেণী থেকে নিয়োগ করা হয়। এর ফলে বাহিনীর নিম্নতন সদস্যরা অতি সহজেই উচ্চবিত্তের রাজনীতিক নেতৃত্বকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়। তবে আনুগত্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণজাত শৃঙ্খলার জন্য তারা সামরিকবাহিনীর উচ্চ পদস্থদের কর্তৃত্ব মেনে নেয়। এ ক্ষেত্রেও সামাজিক শ্রেণীগত বিভেদ একটা সক্রিয় উপাদান। S. E. Finer[১৮] ও S. P. Huntington[১৯] নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে ইদানীং সামরিক হস্তক্ষেপের প্রবলতাকে লক্ষ করে মন্তব্য করেছেন যে,

এই সমস্ত দেশগুলোতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সামরিক অভ্যুত্থানের কারণ যত না সামরিক তার চেয়ে অনেক বেশী সামাজিক। সামরিক ও সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক ভাল থাকলেও, অনেক সময় সামাজিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কাঠামোর দুর্বলতাই সামরিক অভ্যুত্থানকে ত্বরান্বিত করে। রাজনৈতিক কাঠামোর এই দুর্বলতার কারণ বহু হতে পারে। তবে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যখন অযোগ্যতা, দুর্নীতি ও অবৈধ কার্যকলাপ ইত্যাদি অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, তখন জনসাধারণই পরোক্ষভাবে সামরিক অভ্যুত্থান আকাঙ্ক্ষা করে। এবং সামরিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে প্রাথমিক পর্যায়ে তাকে সমর্থন করে—কারণ আশু পরিবর্তনের আশায় তারা অন্য কিছু আর চিন্তা করতে চায় না।

পৃথিবীর অধিকাংশ উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দেশে সামরিকবাহিনীকে গড়ে তোলা হয় জাতীয় স্বার্থের অন্যতম রক্ষক হিসাবে। এবং জাতীয় স্বার্থ ও পররাষ্ট্র আক্রমণ থেকে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় কাজে সর্বাপেক্ষা সচেতন ও সক্রিয় গোষ্ঠী হিসাবে সমাজের অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে তাদের মূল্যবোধ ভিন্ন প্রকৃতির হয়। মূল্যবোধগত পার্থক্য সামরিক ও সামাজিক-গোষ্ঠীর মধ্যে সুস্পষ্ট হওয়ার জন্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সরকারী ব্যবস্থা জনগণের পরোক্ষ সমর্থন হারালেও সামরিকবাহিনী জনগণের প্রত্যক্ষ সমর্থনের অভাবে সরকারী ক্ষমতা অধিগ্রহণ করতে সমর্থ হয় না। সুতরাং এক্ষেত্রে সরকার ও সামরিকবাহিনীর মধ্যে জনগণ এক প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে।

সমাজতন্ত্র, সামরিকবাহিনী ও রাজনীতি

তৃতীয় বিশ্বে সামরিক অভ্যুত্থান আজ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এমন কি ক্রমান্বয়ে সামরিক অভ্যুত্থান একটা সাধারণ ঘটনায় পর্যবসিত হয়ে পড়ছে। তবুও সামরিক অভ্যুত্থানের কারণ নির্ণয়ের ইচ্ছা আরও বেশী করে গবেষকদের নাড়া দিয়ে চলেছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে সামরিকবাহিনীকে এক ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা হয়, যা বহুলাংশে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত। বিশেষত সমাজতান্ত্রিক দেশে রাজনীতির অন্যতম সক্রিয় অংশ হিসাবে সামরিক বাহিনী অবস্থান করে। এবং একটি মতাদর্শের দ্বারা তাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই মতাদর্শই বৃহত্তরভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকেও

নিয়ন্ত্রণ করে। J. Von. Doorn[22] এ প্রসঙ্গে কতকগুলি পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন :

(ক) পূর্বনির্বাচিত নিয়োগ পদ্ধতি : সামরিকবাহিনীকে নিয়োগের ক্ষেত্রেও তাদের সামাজিক আর্থনীতিক শ্রেণী-অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থাকা হয়। তিনি একটি পরিসংখ্যানের দ্বারা দেখিয়েছেন, 1960 সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত পোল্যাণ্ডের অর্ধেক সামরিক সচিব, রাশিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ, পূর্ব জার্মানীর চার-পঞ্চমাংশ সামরিক সচিবের পারিবারিক প্রেক্ষাপট ছিল শ্রমিকশ্রেণীজাত। এ ছাড়াও বিভিন্ন পদ থেকে দ্রুত পদোন্নতির সম্ভাবনা, সরাসরি সচিব পদে না নিয়োগ করা এবং একটি সুনির্দিষ্ট মতাদর্শে আস্থাশীলতাও নিয়োগের ক্ষেত্রে পরিগণিত হয়।

(খ) মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিতকরণ : সাধারণত প্রায় সমস্ত সামরিক সচিবই হয় প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিক দলের সদস্য নতুবা সমর্থক। এছাড়াও সামরিক কলাকৌশল শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠানগুলোও ব্যাপকভাবে মতাদর্শের প্রচারকার্য চালায়।

(গ) রাজনীতিক দলের অনুপ্রবেশ : সামরিকবাহিনীকে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিক দলের অনুবর্তী করে রাখা হয়। এছাড়াও রাজনীতিক দল, বিভিন্ন আধা-সামরিক বাহিনী এবং সমস্ত পুলিস বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে সামরিক বাহিনীকে সমাজগঠনে সাহায্যকারী শক্তি হিসাবে দেখা হয়।

সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে সামরিকবাহিনীর গঠন পদ্ধতি অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে সামরিকবাহিনীর ভূমিকা অনুধাবন করা। কারণ তা আমাদের সমাজতান্ত্রিক দেশে সামরিকবাহিনী গঠনের পদ্ধতি অনুসরণে সহায়তা করবে। এ সম্পর্কে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও যুক্তিগ্রাহ্য আলোচনা Jack Woddis তাঁর *Armies and Politics*[23] গ্রন্থে করেছেন, যা এই ব্যাপারটাকে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে গবেষকদের সাহায্য করতে পারে।

রাজনীতিক ক্ষমতাকাঠামোয় সামরিকবাহিনীর ভূমিকা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে রাজনীতিক ক্ষমতার প্রকৃতি অনুধাবন করা প্রয়োজন, তা না হলে

যোজ

সামগ্রিক রাজনীতিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে সামরিকবাহিনীর সতত পরিবর্তনশীল ভূমিকাকে সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারব না। কারণ আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন সামরিকবাহিনী সামগ্রিক রাজনীতিক ব্যবস্থারই অংশবিশেষ—কোন নিরপেক্ষ বা বিচ্ছিন্ন অংশ নয়।[২২] সাধারণত উদারনীতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশের পদ্ধতি অনুসরণকারী অনুন্নত বা নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহে সরকারী ব্যবস্থা কিংবা সংসদকেই রাজনীতিক ক্ষমতার চরম আধার বলে মনে করা হয়। এর বিরোধিতা করে কিছু কিছু অতি বাম-ঘেঁষা রাজনীতিক দলগুলো মনে করে যে সামরিক ক্ষমতাই শ্রেণীশাসনের অন্যতম উৎস এবং সংসদীয় প্রথা বা সরকারী ব্যবস্থার বিন্দুমাত্র বিরোধিতাকে শাসকশ্রেণী বিনা দ্বিধায় সামরিক সহায়তায় নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করে। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই বিশ্লেষণ সরলীকরণ দোষে দুষ্ট। একদিক থেকে, রাজনীতিক সিদ্ধান্ত অনুসারে অন্যকে বশীভূত বা অন্যের আনুগত্য অথবা অন্যের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাই রাজনীতিক ক্ষমতা। এই ক্ষমতা শাসকশ্রেণী বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করে। এবং তা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সামরিকবাহিনী শাসকশ্রেণীর অন্যতম সহায়ক শক্তি। ক্ষমতা প্রয়োগের সমস্ত প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে শাসকগোষ্ঠী শেষ অস্ত্র হিসাবে সামরিক শক্তিকে ব্যবহার করে। অর্থাৎ সামরিক শক্তিকে যদি আমরা রাষ্ট্রশক্তির একক উৎস হিসাবে মনে করি, তবে আমাদের ভুল হবে।

মার্কসীয় ব্যাখ্যা অনুসারে উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পর্কই রাজনীতিক ক্ষমতার অন্যতম উৎস। এবং অর্থনীতিক ভিত্তিই রাজনীতিক পরিকাঠামো নির্দিষ্ট করে। এই রাজনীতিক ক্ষমতা তিনভাবে প্রয়োগ করা হয়। প্রথমত, সমাজস্থ মানুষের চিন্তা-ভাবনা, অভ্যাস, প্রথা, ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে আপাত বিরোধিতার মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টির প্রয়াস করা হয়। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, সংসদ ইত্যাদির এক বিশেষ নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি গঠন করে তার মধ্যে সাংবিধানিক কাঠামোকে সামনে রেখে 'শ্রেণীনিরপেক্ষ' শাসনব্যবস্থার মূল্যবোধের বাতাবরণ সৃষ্টি করা হয়। তৃতীয়ত, অর্থনীতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানাকে আইনানুগ স্বীকৃতি জানিয়ে তার প্রাধান্য সামাজিক ক্ষেত্রে বিস্তার করা হয়, এবং ব্যক্তিগত অধিকার ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের মনে রাষ্ট্রশক্তির প্রতি আস্থাভাব সঞ্চার করার চেষ্টা করা হয়। রাষ্ট্র এই ধরনের মূল্যবোধ

গঠনের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্য গ্রহণ করে থাকে, অন্যদিকে তেমনি বহুদলীয় রাজনৈতিক প্রথা প্রতিষ্ঠা করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার প্রয়াস করে। অবশ্য রাষ্ট্র যখন কোন বিশেষ অবস্থায় বা বিশেষ সময়ে কোন সংগঠিত বিরোধিতার সম্মুখীন হয়, তখন বলপ্রয়োগকারী বিভিন্ন সংস্থার সাহায্য তার পক্ষে জরুরী হয়ে পড়ে, যার মধ্যে সামরিকবাহিনী অন্যতম। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সাধারণ অবস্থায় সমাজের মানুষ অতি সহজেই বিশ্বাস করে যে পুলিস, আধা সামরিকবাহিনী বা সামরিকবাহিনী ইত্যাদি মূলত তাদেরই স্বার্থ সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত। এই স্বার্থ একদিকে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ, যার উদ্ভব সাংবিধানিক কাঠামোয়, অন্যদিকে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ, যার উদ্ভব জাতীয়তাবাদ বা জাতীয় স্বার্থ সংক্রান্ত মূল্যবোধের মধ্যে দিয়ে। এই ধরনের মূল্যবোধ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্রব্যবস্থার স্থায়িত্বের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী।

সুতরাং রাষ্ট্র যতদিন পর্যন্ত জনমতের স্বীকৃতি ও বলপ্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে নিজেদের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ততদিন পর্যন্ত তার পক্ষে ক্ষমতা করায়ত্ত রাখা অত্যন্ত সহজ হয়। এমনকি অনেক দেশে রাষ্ট্রশক্তি সামরিকবাহিনী নিরপেক্ষে কোন বিরোধী শক্তিশালী সামাজিকগোষ্ঠীর সহায়তায় ক্ষমতা বজায় রাখতে সমর্থ হয়। রাষ্ট্র অবশ্যই শুধু বলপ্রয়োগের সাহায্যেই তার ক্ষমতা বজায় রাখতে পারে না, ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য বলপ্রয়োগ ছাড়াও আনুগত্য দরকার। এবং তার রাজনৈতিক ক্ষমতার অন্যতম স্তম্ভ হচ্ছে এই আনুগত্য। সুতরাং সামাজিক তথা রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য শুধু বলপ্রয়োগ বা হিংসাত্মক বিপ্লবই যথেষ্ট নয়, তার আগে দরকার একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শের ভিত্তিতে যৌথমত গঠন করা ও একটি সংগঠন গড়ে তোলা, যা ক্রমান্বয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করবে। মনে রাখা দরকার, কোন রাষ্ট্রই বলপ্রয়োগের মাধ্যমে টিকে থাকতে পারে না। যে কোন অবস্থাতেই ক্ষমতা বজায় রাখতে একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শের প্রয়োজন হয়। এমনকি ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রেও একটি মতাদর্শ ছিল। একথাও ঠিক যে, রাষ্ট্র তার একক প্রচেষ্টায় ক্ষমতা বজায় রাখতে পারে না। সেক্ষেত্রে তার প্রয়োজন হয় বিভিন্ন শ্রেণী ও রাজনৈতিক শক্তিসমূহের মধ্যে সমঝোতামূলক সম্পর্কের। এবং বিভিন্ন শ্রেণীর সাহায্যে ই সে তার স্থায়িত্ব বজায় রাখে। যেমন গ্রাম্‌সির বক্তব্য

থেকে আমরা জানতে পারি যে 1917 সালে বিপ্লবের প্রাক্কালে রাশিয়ার শাসকশ্রেণী অন্যান্য শ্রেণী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে একটি ক্ষুদ্র একক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল—যার ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য বলপ্রয়োগ ভিন্ন অন্য কোন পথ ছিল না। সুতরাং ক্রামসির মতে তখন দরকার ছিল একটি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এই ছোট শাসকশ্রেণীটিকে ধাক্কা মেরে অপসারিত করা।[২৩] অতএব বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা যখন জোরদার হয়ে ওঠে, যখন শাসকশ্রেণীর ক্রমাগত বিচ্ছিন্নতা ও শ্রমিকশ্রেণীর একতা একই সঙ্গে বেড়ে চলে, তখন রাষ্ট্রশক্তি তার ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য শেষ অস্ত্র হিসাবে সামরিকবাহিনীর চণ্ডশক্তিকে ব্যবহার করে।

সুতরাং একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে রাষ্ট্র যে-কোন অবস্থাতেই শুধু সামরিকবাহিনীর শক্তির ওপর নির্ভরশীল। লেনিনের মতে রাষ্ট্র তখনই শুধু এর বলপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করে যখন সে তার নিজের অস্তিত্বের স্বার্থে এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এর প্রয়োজনীয়তা থাকে ততক্ষণই সে এটাকে ব্যবহার করে। তাছাড়াও বলপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করার সময়েও এগুলোর ওপর রাষ্ট্রের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বহাল থাকে। অর্থাৎ এগুলো রাষ্ট্রের প্রয়োজনানুসারে ও নির্দেশিত পথে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং রাষ্ট্র কেবল বলপ্রয়োগকারী সংস্থা এই কথাটার শব্দগত অর্থ অনুধাবন করার চেয়ে এর অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করাই যুক্তিযুক্ত। তাহলেই রাষ্ট্রব্যবস্থায় সামরিকবাহিনীর ভূমিকাকে আমরা ঠিকভাবে বুঝতে পারব।

সামরিকবাহিনী অপরাপর সামাজিকগোষ্ঠীর মতই একটি বিশেষ শ্রেণীচরিত্রের ভিত্তিতে গঠিত হয়। তাই তাকে সমাজনিরপেক্ষ রাষ্ট্রশক্তির 'যন্ত্র' হিসাবে দেখা ঠিক নয়। সামরিকবাহিনীর নিম্নতন স্তর মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তের লোকদের নিয়ে গঠিত হলেও, উচ্চস্তরের সচিবগণ আর্থনীতিক ক্ষমতাসম্পন্ন শ্রেণী বা উচ্চবিত্তের মধ্যে থেকেই নিযুক্ত হন। এবং কড়া অনুশাসন-প্রক্রিয়া অনুসারে নিম্নতন স্তর উচ্চতম স্তরের নিয়ন্ত্রণে থাকতে বাধ্য হয়, ফলত উচ্চস্তরের সচিবদের সঙ্গে রাজনীতিক শাসকদের কোন মূল্যবোধগত পার্থক্য থাকে না। তাই রাষ্ট্র যতদিন তার এই শক্তিকে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারে ততদিন তার অস্তিত্ব বিনষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। অনেক সমাজবাদী লেখক

মনে করেন যে যতক্ষণ না সামরিকবাহিনীর একটা অংশের সক্রিয় সাহায্য পাওয়া যায় ততক্ষণ বিপ্লবের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।[১৮] এই কথাটা বিশেষত 25th April 1974-এ পোর্তুগালে ফ্যাসিবাদী সরকার উচ্ছেদে সামরিক-বাহিনীর ভূমিকার দিকে লক্ষ করেই বলা হয়েছে। তবে একথার সত্যতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ এক্ষেত্রে সামরিকবাহিনীকে মূলত সমাজবিচ্ছিন্ন একটা শক্তি হিসাবে দেখা হচ্ছে, রাষ্ট্র ও সমাজের বাইরে যার একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন অস্তিত্ব আছে। কিন্তু একথা ঠিক নয়। বরং, সামরিকবাহিনী হল শাসকশ্রেণীর দ্বারা গঠিত একটি বিশেষ শক্তিগোষ্ঠী, যা শাসকশ্রেণীকে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় কর্তৃত্ব জীইয়ে রাখতে সাহায্য করে। অতএব বিশেষ অবস্থায় সামরিকবাহিনী তার শ্রেণীচরিত্র অনুযায়ী বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করে, অথবা শাসকশ্রেণীর সাহায্যকারী শক্তি হিসাবে বিপ্লব দমন করতে চেষ্টা করে। অবশ্য তৃতীয় বিশ্বের নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর ক্ষেত্রে অবস্থাটা একটু পৃথক, কারণ সেখানে জনগণই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের স্বার্থে সেনাবাহিনী গঠন করে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে লড়াই করে।

সামরিক অভ্যুত্থানকে অনেকে রাষ্ট্রশক্তির নিয়ন্ত্রণ 'অক্ষমতা' হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু সামরিক অভ্যুত্থানের কারণ যত না সামরিক তার চেয়ে অনেক বেশী সামাজিক ও রাজনৈতিক। সুতরাং সামরিকবাহিনী রাষ্ট্রশক্তি বজায় রাখার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র বা অস্ত্র এরূপ ব্যাখ্যা একটি যান্ত্রিক ও সরলীকৃত বক্তব্য। কারণ সামরিক রাষ্ট্রশক্তি সময় বিশেষে তার ভারসাম্য বজায় রাখার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করলেও তাকে স্থায়িত্ব রক্ষার প্রধান অস্ত্র হিসাবে সব সময় ব্যবহার করতে পারে না। রাষ্ট্রশক্তির মূল উৎস একদিকে যেমন বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে সমঝোতা, অন্যদিকে জনগণের আনুগত্য। এই দুটোর স্থায়িত্ব বিনষ্ট হলে, সামরিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে।

দু ধরনের রাজনৈতিক উপাদান সামরিকবাহিনীর ভূমিকাকে নির্ধারণ করে। প্রথমত, সামরিকবাহিনী নিরপেক্ষে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সম্পর্ক, রাজনৈতিক স্থায়িত্বের অন্যতম উৎস। এবং এই সম্পর্কই রাষ্ট্র কর্তৃক সামরিকবাহিনীকে ব্যবহার করার সম্ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়াও রাষ্ট্রশক্তির মধ্যস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বার্থগত ঐক্য বা অনৈক্য সামরিকবাহিনীর ভূমিকাকে নির্ধারণ করে।

রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যস্থ শক্তিসমূহ বহুক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি বা স্থিতাবস্থা আনার জন্য সরাসরি সামরিকবাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করতে পারে।

প্রায় সমস্ত দেশেই সামরিকবাহিনীকে আপেক্ষিকভাবে শ্রেণীনিরপেক্ষ শক্তি হিসাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। এর সাহায্যে রাষ্ট্রশক্তিও তার নিরপেক্ষতার ভাবমূর্তি বজায় রাখতে চায়। বিশেষ প্রশিক্ষণ ও সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যারাকের মধ্যে আবদ্ধ রেখে সামরিকবাহিনীর নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করা হলেও সামরিক সদস্যগণ পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়। রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা সামরিকবাহিনীকে সচেতন-ভাবে এই প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা সম্ভবপর নয়। এমন কি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর সমন্বয় বা বিরোধিতার দ্বারাও সামরিকবাহিনী প্রভাবিত হয়ে থাকে। তাই রাজনীতিক প্রক্রিয়ার কোন একটি নির্দিষ্ট স্তরে শাসকগোষ্ঠী কোনভাবেই সামরিকবাহিনীর ওপর তার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে না। যেমন 1964 সালে সুদানে জেনারেল আবোউদ সামরিকবাহিনীকে কোনভাবে ধর্মঘটরত বিপুল জনসংখ্যার বিরুদ্ধে নিয়োজিত করতে পারেন নি। আবার 1984 সালে ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পরিণতিস্বরূপ 'পাঞ্জাব বাহিনী'-র একাংশ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সামাজিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রশক্তি অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে রাজনীতিক সমঝোতা প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়েছিল বলেই, সেই একাংশকে বিচ্ছিন্ন করে সামরিক আইন ভঙ্গকারী হিসাবে শাস্তি দেওয়া সম্ভবপর হয়েছিল। সুতরাং সামরিকবাহিনী সম্পর্কে বাম-মনোভাবাপন্ন চিন্তাবিদদের এরূপ একটা সদর্থক ধারণা গড়ে ওঠা দরকার যে সামরিকবাহিনী শুধু রাষ্ট্রশক্তির যন্ত্র নয়, তাদেরও একটা নিজস্ব সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত আছে। তাই এটা অনস্বীকার্য যে আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত ও আধুনিক প্রশিক্ষণে শিক্ষিত সামরিক সদস্যগণ বিপ্লবের এক উপযুক্ত সাহায্যকারী শক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশের শাসকরাও সামরিকবাহিনীর এই সদর্থক ভূমিকার প্রতি যথেষ্ট সচেতন। তাই সামরিকবাহিনী নিয়োগ, পদোন্নতির ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে আরও গণতান্ত্রিকীকরণের প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। তাছাড়াও সামরিকবাহিনীকে শক্তিশালী চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসাবেও অনেক দেশে প্রাধান্য দেওয়ার এবং এমন এক মূল্যবোধের প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে সামরিকবাহিনীর সদস্যরা একদিকে

যেমন নিজেদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার অন্যতম অগ্রণীবাহিনী হিসাবে মনে করে, অন্যদিকে নাগরিক স্বাধীনতার রক্ষক হিসাবে নিজেদের গণ্য করে। এইরূপ মূল্যবোধের সম্প্রসারণ হেতু সমাজের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী সামরিকবাহিনীকে এক ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে আরম্ভ করেছে। অন্যদিকে সামরিকবাহিনীও আরও প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে নিজেদেরকে যুক্ত করতে পারছে। ফলত এক বিশেষ পরিস্থিতি ও সময়ে সামরিকবাহিনী বৃহত্তর জনগণের সাহায্যকারী শক্তি হয়ে উঠবে না রাষ্ট্রশক্তির স্থিতির সহায়ক হয়ে উঠবে সেইটেই হল প্রশ্ন। যদিও সামরিকবাহিনীর মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ব্যাপক প্রসার তাকে অনেক ক্ষেত্রেই জনগণতন্ত্রের অগ্রণীবাহিনী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করছে।

তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত এবং নবস্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর সামরিক বাহিনীর ভূমিকা পর্যালোচনা করতে গিয়ে বহু গবেষক মার্কস ও এঙ্গেলস্-এর বিভিন্ন বক্তব্যের উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, তৃতীয় বিশ্বে কোন কোন ক্ষেত্রে সামরিকবাহিনী তার স্বাধীন ভূমিকাসহ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এক বিশেষ গোষ্ঠী হিসাবে সক্রিয়।[২৫] কারণ জনগণই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের স্বার্থে, ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রয়োজনে সামরিকবাহিনীকে গঠন করে এবং যুদ্ধ পরিচালনায় তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এর অন্যতম উদাহরণ বাংলাদেশ। যা হোক, এর ফলে সামরিকবাহিনী আরও সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকে, এবং রাষ্ট্রশক্তির বিন্দুমাত্র দুর্বলতা বা শিথিলতার সুযোগে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে। এই সমস্ত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সমঝোতামূলক সম্পর্ক গড়ে না ওঠার ফলে শাসকশ্রেণীর কোন গোষ্ঠীই স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা বজায় রাখতে পারে না। তাই সামরিকবাহিনীও অতি সহজেই এক নিয়ন্ত্রণমুক্ত গোষ্ঠী হয়ে পড়ে। এই ধরনের সরলীকরণের সাহায্যে বহু গবেষক তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের ঘন ঘন সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন।

মার্কস ও এঙ্গেলসের রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত লেখাগুলো[২৬] যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব যে যখন সমাজে শ্রেণী বিরোধিতা চরমে ওঠে এবং ক্রমান্বয়ে পূর্ণ মিলনের অযোগ্য হয়ে শ্রেণীগুলো পারস্পরিক শত্রু ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে, তখন অর্থনৈতিক প্রভুত্বকারী শ্রেণী ক্ষমতা দখল করে এবং সেই ক্ষমতার সাহায্যে শ্রেণী বিরোধিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে নিজের

কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং রাষ্ট্র এবং তার অন্তর্গত সামরিকবাহিনী কখনই শ্রেণীগতভাবে নিরপেক্ষ শক্তি হতে পারে না। যদিও এই শক্তিটিই, এঙ্গেলসের মতে, সমাজ থেকে আপাত বিচ্ছিন্নভাবে সমাজের ওপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তবুও এটা সামাজিক শ্রেণীনিরপেক্ষ কোন শক্তি নয়। বরঞ্চ সামরিকবাহিনী হল শাসকশ্রেণীর দ্বারা গঠিত একটি বিশেষ শক্তিগোষ্ঠী, যা শাসকশ্রেণীকে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং উৎপাদন ব্যবস্থার কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

অবশ্য কোন বিশেষ সময়ে সামরিকবাহিনীর স্বাধীন ভূমিকা দেখা গেলেও যেতে পারে। সমাজ পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে, অর্থাৎ দুটি আর্থনীতিক ব্যবস্থার মধ্যবর্তী সময়ে সামরিকবাহিনী স্বাধীন শক্তি হয়ে উঠতে পারে।[২৭] কিন্তু এরকম অবস্থাতেও সামরিকবাহিনী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেও কোন সময়েই সমাজের প্রভুত্বকারী শ্রেণীস্বার্থের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে পারে না। কারণ প্রথমত, যে সমাজের মূল ভিত্তি ব্যক্তিগত মালিকানাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সেখানে সামরিকবাহিনীকে প্রধানত স্থিতাবস্থা বজায় রাখার শক্তি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তাই ক্ষমতা দখলের পরও সামরিক বাহিনীর মূল উদ্দেশ্য থাকে সমাজে স্থায়িত্ব প্রদান করা। দ্বিতীয়ত, বিশেষ কোন অবস্থায় সামরিকবাহিনী ক্ষমতা দখলের পর, হয় তারা প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করে, অথবা তা ভেঙে দেয়। যে-কোন অবস্থাতেই তাকে সরকার তথা রাষ্ট্রের সমস্ত পরিচালন দায়িত্ব গ্রহণ করার পর একদিকে যেমন বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সামাজিক-আর্থনীতিক নীতি গ্রহণ করতে হয়, অন্যদিকে তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাকে একটা নির্দিষ্ট মনোভাব গ্রহণ করতে হয়। এই সমস্ত গৃহীত নীতি বা কার্যপদ্ধতির মধ্যে দিয়েই তার দৃষ্টিভঙ্গী ও শ্রেণী-চরিত্রের চিত্রটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে।[২৮]

সুতরাং সামরিকবাহিনী ক্ষমতা দখলের পর, তাকেও দেখা যায় একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীচরিত্রের ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতে; এবং সেই অনুসারে রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করতে। অতএব সামরিকবাহিনী কোন শ্রেণীনিরপেক্ষ শক্তি নয়। কোন কোন দেশে বিশেষ অবস্থায় সামরিকবাহিনীকে বিবদমান শ্রেণীগুলোর মধ্যে সমন্বয়সাধনকারী গোষ্ঠী হিসাবে দেখা গেলেও, সে ক্ষেত্রেও সামরিকবাহিনীর শ্রেণীচরিত্রটা অত্যন্ত স্পষ্ট থাকে।[২৯]

সামরিক অভ্যুত্থান ও তার কারণ

সামরিক অভ্যুত্থানের কারণ সঠিকভাবে নির্ণয় করা শক্ত। সামরিক অভ্যুত্থানের প্রশ্নটি আমরা দুটি চূড়ান্ত পরিস্থিতি কল্পনা করে নির্ণয় করার চেষ্টা করতে পারি। প্রথম পরিস্থিতি অনুযায়ী সামরিকবাহিনী সম্পূর্ণ ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারে, আর দ্বিতীয় পরিস্থিতি অনুসারে সামরিকবাহিনী রাষ্ট্রীয় শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। এই দুই চূড়ান্ত পরিস্থিতির মধ্যবর্তী বহু স্তর আছে। যেমন প্রথমত, সামরিকবাহিনী তাদের ক্ষমতার দ্বারা একটি রাজনৈতিক শক্তিকে উচ্ছেদ করে অপর একটি রাজনৈতিক শাসকগোষ্ঠীকে সরকারী ব্যবস্থায় কায়েম করতে পারে। দ্বিতীয়ত, সামরিকবাহিনী প্রতিষ্ঠিত শাসকগোষ্ঠীর অন্যতম সমর্থকরূপে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে। তৃতীয়ত, অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সামরিকবাহিনীর এক গোষ্ঠী অপর কোন গোষ্ঠীর হাত থেকে ক্ষমতা দখল করে নিতে পারে। চতুর্থত, সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সরাসরি ক্ষমতা দখল না করেও শাসকগোষ্ঠীর ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করা যায়।

প্রধানত শিল্পোন্নত উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দেশসমূহে সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনা বিরল। যদিও বিদেশী নীতি নির্ধারণে, প্রতিরক্ষা নীতি নির্ধারণে, এবং তাদের নিজেদের সুযোগ-সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে তারা যথেষ্ট তৎপর। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রবণতা তাদের অত্যন্ত কম। এমন কি 1914 সালে আয়ারল্যাণ্ডের স্ব-শাসনের আন্দোলনের পটভূমিতে কিছু সামরিক সচিব সরকারী আদেশ অমান্য করে পদত্যাগ করলেও, সেই ঘটনাকে ব্রিটেনে সামরিক অভ্যুত্থান বলে মনে করার কোন কারণ নেই। সরকারী আদেশের প্রতিবাদস্বরূপ তারা পদত্যাগ করলেও, ক্ষমতা দখলের কোন চেষ্টা তাঁরা করেননি।

অনেক সময় এরকম ধারণা করা হয়, যে, সামাজিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অসন্তোষ ও আন্দোলনের ক্রমস্ফীতি সামরিক অভ্যুত্থানকে ত্বরান্বিত করে। এবং সামাজিক ও আর্থনীতিক ব্যবস্থার ক্রমাবনতি আধুনিকতায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সামরিকবাহিনীকে ক্ষমতা দখলে প্রলুব্ধ করে। অনেক গবেষক মনে করেন যে উন্নয়নশীল ও নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে (যেগুলো প্রধানত সামরিক অভ্যুত্থানের সমস্যায় জর্জরিত) সমাজের ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে নিয়ন্ত্রক বা সিদ্ধান্ত গঠনকারীগোষ্ঠী সুচিহ্নিত নয়। এবং উন্নত প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্য অথবা প্রশাসনিক স্তরে ব্যাপক দুর্নীতি

ও অযোগ্যতার জন্য নিয়ন্ত্রক ও নিয়ন্ত্রিতদের পারস্পরিক প্রভাবিতকরণের ধারার মধ্যে দুর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠে। রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ নিজের দুর্বলতা ঢাকার জন্য এবং মাথা চাড়া দিয়ে-ওঠা বিভিন্ন গোষ্ঠীকে দমন করার জন্য সামরিকবাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করে, এবং নিজে স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গে সমঝোতামূলক সম্পর্ক না থাকার জন্য ক্রমাগতে রাষ্ট্রশক্তির দুর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠে। অপরদিকে আর্থনীতিক ও সামাজিক পশ্চাৎপদতার জন্য সমাজের মধ্যে ঐকমত্যের পরিবর্তে বিচ্ছিন্নতাই বেড়ে চলে। এবং সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী হিসাবে সামরিকবাহিনীর অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সামরিকবাহিনীও উন্নতি ও শাসনব্যবস্থার আধুনিকীকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রথম দিকে জনসমর্থন লাভ করে।

সামাজিক গোষ্ঠীসমূহের সচেতন মনোভাবের অভাব বহুক্ষেত্রে সামরিক অভ্যুত্থানকে ত্বরান্বিত করে। অনুন্নত দেশসমূহে দেখা যায় সামরিকবাহিনীর সদস্যদের এক বিশেষ মর্যাদা বা গুরুত্ব দেওয়া হয়। অসংগঠিত আর্থ-রাজনীতিক ব্যবস্থা, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে আগাগোড়া কলহ, বৃহৎ শক্তির টানাপোড়েন, ও ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাব উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশগুলোতে সামরিকবাহিনীর গুরুত্ব অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। একদিকে আভ্যন্তরিক শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও অন্যদিকে জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, এই দুই সমস্যার মোকাবিলায় অনুন্নত বা উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর শাসকগোষ্ঠী বহুলাংশে সামরিকবাহিনীর ওপর নির্ভর করে থাকে। ফলে রাষ্ট্রশক্তি যখনই তার বৃহত্তর সামাজিক সমর্থন হারায়, তখন সামরিকবাহিনীর পক্ষে ক্ষমতা দখল করা সহজ হয়ে পড়ে।

সামরিক অভ্যুত্থানের কারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, সামগ্রিক ব্যবস্থার রাষ্ট্র বা অসামরিক শাসনব্যবস্থা ও সামরিক-গোষ্ঠী দুটি আপাতভাবে ভিন্নমুখী শক্তি। এবং সামরিকবাহিনী বহুক্ষেত্রে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ন্যায় সরকারী ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টির মাধ্যমে তার দাবি-দাওয়া আদায় করলেও, তাকে অন্যান্য সামাজিকগোষ্ঠীর সমপর্যায়ভুক্ত করা যায় না। শুধু পশ্চিমের উদারনীতিক দেশসমূহে নয় সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে সাংবিধানিক ও ব্যবহারিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সব সময়ই চেষ্টা করা হয় সামরিকবাহিনীকে রাজনীতিক প্রশাসনের অনুগামী করে তুলতে। এমন কি 1937-38 সালে স্তালিন কঠোরভাবে সামরিক শক্তিকে অসামরিক নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। এই লক্ষ্য কার্যকর করতে গিয়ে স্তালিন

বহুলাংশে পশ্চিমী ভাবধারার অনুবর্তী হতেও কুণ্ঠিত হননি। আবার 1955 সালে খ্রুশ্চেভ, ম্যালেনকভকে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরাজিত করতে সামরিকবাহিনীর সমর্থন গ্রহণে দ্বিধা করেননি, এবং সামরিকবাহিনীর সমর্থনের প্রতিদান স্বরূপ খ্রুশ্চেভ ক্ষমতালাভের পর মার্শাল জুকভকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী করেন। কিন্তু 1 57 সালে মার্শাল জুকভকে সরিয়ে পুরোপুরি অসামরিক সরকার গঠন করেন। অর্থাৎ যে-কোন ব্যবস্থাতেই সামরিকবাহিনীর হস্তক্ষেপ একটি সীমা পর্যন্ত সাধারণ অবস্থায় মেনে নেওয়া হয়। তার চেয়ে বেশী যখন সামরিকবাহিনী রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে তখন তা রাষ্ট্রীয় দুর্বলতার কারণেই ঘটে।

ইদানীং অনুন্নত ও নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে সামরিকবাহিনীর অত্যধিক ক্ষমতাবৃদ্ধি সামরিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনাকে যথেষ্ট পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে সামরিকবাহিনী প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ না করলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সামরিক-বাহিনীর প্রভাব বহুগুণ বেড়ে গেছে। 1961 সালে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার তাঁর বিদায়কালীন ভাষণে উদ্বেগের সঙ্গে একথা উল্লেখ করেন। নয়া সাম্রাজ্যবাদের যুগে বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর প্রভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অসামরিক শাসকশ্রেণী ক্রমান্বয়ে আরও বেশী সামরিক শ্রেণীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। বাস্তবে পেন্টাগনের নির্দেশ যে আমেরিকান পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণের অন্যতম সাহায্যকারী সংস্থা এ-বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই সামরিকবাহিনীর ক্ষমতাবৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের মর্যাদাবৃদ্ধির সহায়ক হিসাবে সামরিকবাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে উন্নত বৃহৎ শক্তিগুলি তাদের আন্তর্জাতিক ক্ষমতা বিস্তারের জন্য প্রতিরক্ষা ব্যয় বিপুল পরিমাণে বাড়িয়ে তুলেছে। বৈদেশিক নীতি ও সামরিক ঘাঁটি বিস্তারের সমস্যার সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই সামরিকবাহিনী প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছে।

অপরদিকে বৃহৎ শক্তিগুলির চাপে পড়ে অনুন্নত ও বৃহৎ শক্তির ওপর নির্ভরশীল রাষ্ট্রসমূহ ক্রমান্বয়ে তাদের সামরিকবাহিনীকে একদিকে উন্নত সমরাস্ত্রে সজ্জিত করছে অন্যদিকে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র-সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সামরিকবাহিনীর প্রত্যক্ষ অনুপ্রবেশও মেনে নিচ্ছে। একথা আজ অস্বীকার করা যায় না যে নয়া সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুন্নত দেশসমূহে সামরিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তুলেছে। তাই

যতদিন পর্যন্ত রাজনীতিক এলিটগণ সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে সমঝোতামূলক সম্পর্ক বজায় রেখে সামরিকবাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সমর্থ হবে, ততদিনই সামরিক অভ্যুত্থান ঠেকিয়ে রাখা সম্ভবপর।

অনেক সময় দেখা যায় যে সামরিকবাহিনী ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যেই অভ্যুত্থান ঘটায় না। যেমন 1964 সালে কিনিয়া, তানজানিয়া এবং উগাণ্ডাতে সামরিকবাহিনী রাজনীতিক ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে অভ্যুত্থান ঘটায়নি, তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বেতন ও অন্যান্য উন্নতি এবং উচ্চস্তরে আফ্রিকানদের নিয়োগের বিরোধিতা করা। তাছাড়াও 1966 ও 1968 সালে নাইজিরিয়া ও সিয়েরালিওনে যে সমস্ত সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছিল তা কোন সময়ই রাজনীতিক ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে ঘটেনি। এ ঘটে রাজনীতিক দুর্নীতির প্রতিবাদস্বরূপ কিংবা সেখানকার বিভিন্ন সামাজিক এলিটগোষ্ঠীর মধ্যে কার্য বিবাদের পরিণতি স্বরূপ। অতএব প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থায় কোনরূপ অস্থিতিস্থাপকতা দেখা দিলেই সামরিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। যেমন ইতালীতে এরকম গুজব প্রচলিত আছে যে শাসনব্যবস্থায় কোনরকম বামপন্থী গোষ্ঠী অনুপ্রবেশের অতাধিক চেষ্টা করলেই সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে তা দমন করা হবে।

সামরিকবাহিনী যে সর্বদা শাসনক্ষমতা দখল করার জন্যই অভ্যুত্থান ঘটায়, তা নয়, অনেক সময় রাজনীতিক শাসকগোষ্ঠী থেকে মুক্ত হয়ে সামাজিক ক্ষেত্রে নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্যও তারা তৎপর হয়ে ওঠে। যেমন 1918 সালে বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী পক্ষের শর্তানুসারে জার্মানীর সামরিক আয়তন ও যুদ্ধ-পূর্ববর্তী ক্ষমতা সীমিত করা হলে সামরিকবাহিনী প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিক শাসনের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে অমূর্ত রাষ্ট্রশক্তির প্রতি তাদের আনুগত্য প্রদান করে; তাদের মতে 'The *army serves the state and only the state for it is the state*' ('সামরিকবাহিনী রাষ্ট্রের সেবা করে, এবং শুধু রাষ্ট্রেরই সেবা করে কারণ এটাই হচ্ছে রাষ্ট্র')।

সামরিকবাহিনীর মধ্যেই দু-ধরনের মানসিকতার লোক দেখতে পাওয়া যায়। এক ধরনের সৈনিক কেবল ব্যক্তিগত পেশার স্বার্থে সামরিক-বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত থাকে। অপর ধরনের মানসিকতা উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার নিমিত্ত সামরিক প্রভাব ও শক্তিকে কাজে লাগাতে তৎপর

থাকে। দ্বিতীয় মানসিকতাসম্পন্ন সামরিক সচিবদের ক্ষেত্রেই অসামরিক রাজনৈতিক শাসনে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা প্রবল।

সামরিকবাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ নির্ভর করে বহুলাংশে সমাজমধ্যস্থ রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর ওপর। যে সমস্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রগুলো বিকেন্দ্রীভূত হয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে সে-সব ক্ষেত্রে সামরিকবাহিনীর সামাজিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা প্রবল। এই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অনেক সময় রাজনৈতিক ক্ষমতাকেই তার উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করে।[৩০]

সামরিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা প্রতিটি দেশেই আছে—তা সে উন্নত, উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশ যাই হোক না কেন। কেবল দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এক হয় সামরিক অভ্যুত্থানকে ত্বরান্বিত করে, নতুবা নিয়ন্ত্রিত করে। এই উপাদান দুটো হল রাজনৈতিক ও সামাজিক। রাজনৈতিক ব্যবস্থার গঠন ও অবস্থার প্রভাব সামরিক নেতাদের রাজনৈতিক ব্যাপারে সক্রিয় হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন অনেক দেশের প্রচলিত প্রথা বা সাংবিধানিক ব্যবস্থা অনুসারে সামরিক নেতাগণ অসামরিক শাসনব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ করতে সমর্থ হয়। আবার অসামরিক নেতাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দুর্বলতা অথবা বিরোধী মতবাদকে দমন করার জন্য অসামরিক শাসক কর্তৃক সামরিক সাহায্যের যথেচ্ছ প্রয়োগ সামরিক অভ্যুত্থানের পথ সুগম করে। অন্যদিকে সামাজিক ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ ও চেতনাসম্পন্ন জনগণের অভাব এবং অসামরিক শাসকের শাসনপরিচালনায় দুর্বলতা সামরিক অভ্যুত্থানকে ত্বরান্বিত করে। A. Perlmutter-এর মতে যখন দেশের অসামরিক ও সামাজিক এলিটদের মধ্যে দুর্বলতা, বিচ্ছিন্নতা অথবা সরে থাকার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, তখনই সামরিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। সামরিকবাহিনী সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নেতৃত্বহীনতার সুযোগে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি করতে ও কর্তৃত্বসম্পন্ন ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হয়ে ওঠে।[৩১]

ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক অভ্যুত্থানকে চারটি বিভিন্ন মাত্রার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়; যেগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সামরিকবাহিনী ব্যবহার করে। এগুলো হল, (১) প্রভাব বিস্তার,

(২) ভীতি প্রদর্শন (৩) রাজনৈতিক ক্ষমতা নির্ধারিত করণ ও (৪) রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিপূরকীকরণ।

সামরিকবাহিনী প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে অসামরিক সরকার ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ ও শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে পারে। শাসনব্যবস্থায় 'অনুঘটক'-এর ন্যায় প্রবেশ করে তারা নিজেদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠী অপেক্ষা কার্যকরভাবে নিজেদের স্বার্থ পরিপূরণের চেষ্টা করে। এমনকি অসামরিক গোষ্ঠী যদি স্বার্থপূরণে অনিচ্ছা প্রকাশ করে তবে সরকারকে সরাসরি ভীতিপ্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের স্বার্থানুকূল কাজ করতে বাধ্য করাতে পারে। এবং ক্ষেত্রবিশেষে সামরিক-বাহিনী তার বৈশিষ্ট্যের জন্যই অতি সহজেই সরকারী শাসকবর্গকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

রাজনৈতিক ক্ষমতা নির্ধারণের অর্থ হচ্ছে, সামরিকবাহিনী অসামরিক গোষ্ঠীর দুর্বলতা ও আভ্যন্তরিক অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে নিজেদের সুবিধামতো কোন একটি গোষ্ঠীকে শাসনক্ষমতায় প্রতিষ্ঠা করে তাদের পরোক্ষ ও ক্ষেত্র-বিশেষে প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব সুনিশ্চিত করতে পারে। চতুর্থত, পরিপূরকীকরণের অর্থ হচ্ছে, সরাসরি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ক্ষমতা অধিগ্রহণ ও সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা।

অনুন্নত ও নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে সামরিক অভ্যুত্থানের প্রবণতাকে বহুক্ষেত্রে শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা বা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অভাব ইত্যাদি কারণের দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। একথা ঠিক যে বিভিন্ন শ্রেণীর দ্বন্দ্ব, বিক্ষোভ, আন্দোলন, হিংসাত্মক ঘটনা বা ধর্মঘট, এককথায় সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলার অস্থিরতা সামরিক অভ্যুত্থানের পথ সুগম করে। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের পেছনে থাকে শ্রেণীগত বিরোধ বা সবসময়ই পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে জীইয়ে রাখে। তাই সামরিকবাহিনীর নেতৃবৃন্দ যদি অসামরিক শাসকশ্রেণীর সমস্বার্থসম্পন্ন হন, তাহলে আশু পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে রোধ করার নিমিত্ত সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। আবার অনেক সময় ও অনেক অবস্থায় দেখা যায় যে সামরিকবাহিনী শ্রমজীবী মানুষের সমসঙ্গী হয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে যুক্ত হয়। তাই মোটামুটিভাবে বলা যায়, রাজনৈতিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করতে কিংবা এই পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করতে সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়।

সামরিক অভ্যুত্থানের কারণ নির্ণয় করা শক্ত হলেও অসম্ভব নয়। তবে কারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। তাই 'কারণ' নির্ণয়ের নামে সরলীকরণের প্রচেষ্টা এই গুরুতর সমস্যাটিকে সাধারণ সমস্যার পর্যায়ভুক্ত করে তুলতে পারে। এছাড়াও কারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সামরিকবাহিনীকে শুধু ব্যাপারকবন্ধ-গোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করলে, এর গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী পরিপ্রেক্ষিতটি অবহেলিত হবে। তাই এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে সামরিকবাহিনীর একটি সামাজিক ভিত্তি আছে—যা এর কার্যকলাপকে বহুলাংশে নির্ধারণ করে। আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার, আজ পর্যন্ত যত গবেষক এ ব্যাপারে চিন্তা করেছেন, তাঁদের অধিকাংশ 'কেন সামরিক অভ্যুত্থান একটি দেশে ঘটে?' এর পরিবর্তে 'কি ভাবে সামরিক অভ্যুত্থান বন্ধ করা যায়' তার ওপর বেশী জোর দিয়েছেন। এর কারণ সম্ভবত, সমাজের অন্যান্য চাপসৃষ্টিকারীগোষ্ঠী অপেক্ষা সামরিকবাহিনীর বৈশিষ্ট্য মূলত পৃথক। শুধু তাই নয়, সামরিকবাহিনীর সদস্যগণ আধুনিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক সুশৃঙ্খল গোষ্ঠী। দ্বিতীয়ত, সামরিকবাহিনীর পক্ষে সরকারী ক্ষমতা দখল যত সহজ, অন্যান্য গোষ্ঠীর পক্ষে তত সহজ নয়। এবং তৃতীয়ত, শাসকগোষ্ঠীর কাছে সামরিকবাহিনীই হচ্ছে ক্ষমতা বজায় রাখার শেষ সহায়ক যন্ত্র। তাই এই বাহিনীকে যতটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা যাবে এবং সামাজিক শ্রেণীদ্বন্দ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা যাবে, ততই রাষ্ট্রের পক্ষে স্থিতি বজায় রাখা সহজ হবে।

একদিকে উন্নত দেশে সামরিকবাহিনী যেমন প্রত্যক্ষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিচ্ছে, অন্যদিকে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে তেমনি সরাসরি ক্ষমতা দখল করে তাদের গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠা করছে। অনেক দেশে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অস্থিতাবস্থার অজুহাতেও সামরিক অভ্যুত্থান ঘটছে। এবং সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে মূলত দুটো বিষয়ের ওপর প্রধান নজর দেওয়া হচ্ছে। প্রথমত সমাজের গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগুলোর, যেমন দেশের শিল্প কাঠামো বা প্রযুক্তিসংক্রান্ত কাঠামোর, সক্রিয় সাহায্য লাভের চেষ্টা তাকে করতে হয়। দ্বিতীয়ত, তার শাসনব্যবস্থাকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আইনানুগ করে নেওয়ার চেষ্টা করতে হয়। প্রথমটা সে লাভ করতে না পারলে অল্পদিনের মধ্যেই শাসনব্যবস্থায় তার অক্ষমতা প্রমাণ হয়ে যায়। এবং উন্নতির পরিবর্তে দেশ দ্রুত অবনতির দিকে এগোয়।

আর দ্বিতীয়টি লাভ করতে অক্ষম হলে সামরিক শাসনের মূল উৎস হয়ে পড়ে 'বন্দুক' বা দণ্ডশক্তি। প্রসঙ্গত এ দুটি পারস্পরিক।

S. P Huntington তাঁর *Political Order in Changing Societies* বইতে [২২] Praetorian Society সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, একটি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে মানুষের সম্প্রদায়বোধ রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়, এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। এই চেতনা উন্নততর পর্যায়ে ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রকে শক্তিশালী করে তোলে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে গিয়ে রাষ্ট্র সমাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পরিবর্তে এক আপেক্ষিক স্বাধীনতা লাভ করে। এবং স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য বিভিন্ন সহায়কগোষ্ঠী (যন্ত্র) গড়ে তোলে। এদের অন্যতম হচ্ছে সামরিকবাহিনী। আবার অন্যদিকে প্রাক্তন উপনিবেশগুলোতে মানুষের মধ্যে সম্প্রদায়বোধের অভাবহেতু শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে না উঠলেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহায়তায় আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত সামরিকবাহিনী গড়ে ওঠে। এছাড়াও প্রাক্তন উপনিবেশগুলোকে অনেক ক্ষেত্রেই অনুন্নতির জন্য বৃহৎ রাষ্ট্রের ওপর প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়। অনুন্নতিজাত সমস্যার জন্য সামাজিক বিরোধ রাষ্ট্রীয় অস্থিরাবস্থা ক্রমাগত বাড়িয়ে চলে। এবং এই অবস্থায় বৃহৎ শক্তিগুলোর তাঁবেদার শৃঙ্খলাবদ্ধ সামরিকবাহিনী অতি সহজেই ক্ষমতা দখল করে বৃহৎ শক্তির অনুপ্রবেশ ও ঘাঁটি বিস্তারের পথ সুগম করে।

অনুন্নত দেশগুলোর আর্থনীতিক দুর্বলতা যেমন সামরিক অভ্যুত্থানকে পরোক্ষভাবে ত্বরান্বিত করে তেমনি সঠিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ও চেতনার অভাবও তাদের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে উদাসীন করে রাখে। এমনকি এসব দেশে রাষ্ট্রব্যবস্থার উপযুক্ত আনুষঙ্গিক হিসাবে শক্তিশালী নীতিভিত্তিক রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয় না, অথচ উদারনৈতিক গণতন্ত্রের অনুসরণে বহুদলীয় প্রথাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। শ্রমিক সংঘগুলো শুধু আর্থনীতিক আন্দোলনের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে। এই বিচ্ছিন্নতার সুযোগে তাছাড়াও আর্থনীতিক সাহায্য নিয়ে বৃহৎ শক্তিগুলোর অনুপ্রবেশ ঘটে। এই সমস্ত রাষ্ট্রেই গড়ে ওঠে বৃহৎ শক্তির সামরিক ঘাঁটি।

একথা সত্যি যে কোন একটি রাষ্ট্রে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার অর্থই হল সেখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও শাসক সম্প্রদায় জনগণের আইনানুগ স্বীকৃতি হারিয়েছে। অথবা রাষ্ট্রশক্তি এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে, যে-

অবস্থায় সে হয় সামরিকবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে অক্ষম অথবা তার হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চাইছে। কিংবা, রাষ্ট্রশক্তি তার স্থায়িত্বের অনুকূলে অপরাপর শ্রেণীর সঙ্গে সমঝোতামূলক সম্পর্কে আসতে অপারগ হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সামরিক-বাহিনীর সহায়তায় ক্ষমতা বজায় রাখতে অক্ষম হয়েছে। রাষ্ট্রশক্তি যদি পূর্ণ ক্ষমতায় থাকত, তবে জনসমর্থনের জন্যেই সামরিক অভ্যুত্থান হওয়া সম্ভবপর হত না। যেমন ঈজিপ্টে 1952 সালে যখন সামরিকবাহিনী ক্ষমতা দখল করে তখন পরোক্ষভাবে জনগণ তাদের সমর্থন করেছিল। অভ্যুত্থানের আগে ঈজিপ্টে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক স্বৈরতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। 1958 সালে ইরাকেও এই একই ঘটনা ঘটেছিল। সেখানে রাজার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সৈয়দকেও যখন সামরিকবাহিনীর সদস্যরা হত্যা করেছিল, তখন জনগণ কোন প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ তো করেই নি, উপরন্তু পরোক্ষ সমর্থন করেছিল।

সামরিক অভ্যুত্থানের অন্যতম কারণ হিসাবে আমরা নয়া সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই প্রসঙ্গে লণ্ডনের The Institute of Strategic Studies থেকে প্রকাশিত *Strategic Balance 1978-79* নামক রিপোর্টের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের প্রত্যক্ষ সহায়তায় পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহের অত্যধিক সমরাস্ত্র সংগ্রহের প্রবণতার কথা এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে ইতোমধ্যেই পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশ তাদের সামরিক ব্যয়কে অস্বাভাবিক বাড়িয়ে নিয়েছে। এমনকি এর ওপর আবার পূর্ব ও পশ্চিম ইওরোপের উন্নত দেশগুলো ওই সব অনুন্নত দেশে ক্রমান্বয়ে সামরিক সাহায্য বাড়িয়েই চলেছে। এই সাহায্য দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হচ্ছে উন্নত দেশগুলো সমরাস্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে এই সব এলাকায় তাদের প্রভাব বিস্তার করে চলেছে, যা বর্তমান বৃহৎ রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিস্তারের রাজনীতির অন্যতম উপাদান।

রিপোর্ট অনুসারে মরক্কো, দক্ষিণ কোরিয়া রোডেশিয়া, ইথিওপিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, জাপান ইতোমধ্যেই তাদের সামরিক ব্যয় প্রায় 185 শতাংশ থেকে 300 শতাংশ বাড়িয়ে তুলেছে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দক্ষিণ

জাপান 185 শতাংশ দক্ষিণ আফ্রিকা 200 শতাংশ এবং রোডেশিয়া 230 শতাংশ পর্যন্ত তাদের সামরিক ব্যয় বাড়িয়েছে।

উক্ত সংস্থার রিপোর্ট অনুসারে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোতে—যেমন অন্যান্যদের মধ্যে ইরাক, লিবিয়া, কুয়েত—প্রভাব বৃদ্ধির জন্য পূর্ব ও পশ্চিমের উন্নত দেশগুলো ক্রমান্বয়ে আধুনিক সমরাস্ত্র সরবরাহ করছে বটে তবে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, যে সেই সব সমরাস্ত্র ব্যবহার করতে এই সব দেশের সামরিকবাহিনী জানে না। সুতরাং সমরাস্ত্র ব্যবহার শিক্ষার জন্যও অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশকে বৃহৎ শক্তির সাহায্যপ্রার্থী হতে হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে লিবিয়া তার মোট 30,000 হাজার সৈন্যবাহিনীর জন্য 200 ট্যাঙ্ক সংগ্রহ করেছে। 1976 সালে ইথিওপিয়ার মোট ট্যাঙ্ক ছিল মাত্র 80 (আশিটা), 1978 সালে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় 500-তে। মোজাম্বিকের 1976 সালে কোন ট্যাঙ্ক ছিল না। 1978 সালে এর মোট ট্যাঙ্কের সংখ্যা হয় 150। এমন কি চীনের ন্যায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 1978 সালে সামরিক ব্যয়বরাদ্দ ছিল 35 বিলিয়ন ডলার।

ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ তাদের প্রাক্তন উপনিবেশগুলোতে শাসনকালে একদিকে যেমন পরিকল্পিত উপায়ে সামাজিক উন্নতির ধারাকে পিছিয়ে দেয়, অন্যদিকে তেমনি ক্ষমতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সামরিকবাহিনীকে দ্বিতীয় শক্তি হিসাবে গঠন করে। ফলত স্বাধীনতালাভের পর এই সমস্ত দেশের সামাজিক অনগ্রসরতা, রাজনৈতিক অপূর্ণাঙ্গতা এবং অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগে সামরিকবাহিনী অতি সহজেই ক্ষমতা দখল করতে সমর্থ হয়। এবং তারই সূত্র ধরে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ তাদের প্রাক্তন উপনিবেশগুলোতে প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। সামরিক অভ্যুত্থানের কারণ নির্ণয়ে ঘানার এনক্রুমা (Nkrumah) সরকারের পতন এক অদ্ভুত উদাহরণ স্থাপন করে। অন্যান্য বৃহৎ শক্তির ভয়ে ও সামরিক বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিসমূহের ভয়ে ঘানার রাষ্ট্রপতি এনক্রুমা অন্যতম বৃহৎ শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের শরণাপন্ন হন। এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এনক্রুমার প্রার্থনা অনুযায়ী সেই দেশের সামরিকবাহিনীকে সুশিক্ষিত করে তুলতে আরম্ভ করে। এর ফলে 1966 সালে সোভিয়েত শিক্ষণপ্রাপ্ত সামরিকবাহিনী এনক্রুমাকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করে।

সামরিক অভ্যুত্থানের কারণ প্রসঙ্গে Aharon Cohen** উল্লেখ করেছেন

যে যখন প্রতিষ্ঠিত শাসকগোষ্ঠী শাসনক্ষমতা বজায় রাখতে অক্ষম হয়, এবং দুর্বল মধ্যবিত্ত শ্রেণী তা অধিগ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় ও শ্রমজীবী মানুষ সেই ক্ষমতা দখল করার মতো উপযোগী হয়ে ওঠে না, তখনই সামরিক সচিবগণ অতি সহজেই ক্ষমতা দখল করে শূন্যস্থান পূরণ করে। Ruth First** ও প্রায় একই কথা বলেছেন। সামরিক অভ্যুত্থান সাধারণত তখনই ঘটে যখন একদিকে শাসনকার্য পরিচালনায় সরকারের দুর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠে ও অন্যদিকে অপর কোন শক্তিশালী সামাজিক গোষ্ঠী তা দখল করতে ব্যর্থ হয়।

কিন্তু সর্বত্র ঠিক একই কারণে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। Mirsky** সামরিক অভ্যুত্থানের চারটি কারণ দেখিয়েছেন। সেগুলো হল :

(১) কোন দেশে যদি জাতীয় সরকার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয় এবং অত্যধিক পশ্চিমানির্ভর হয়ে শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে শাসকগোষ্ঠী সচেষ্ট হয় ও সামাজিক উন্নতি অপেক্ষা ব্যক্তিগত উন্নতিকে অধিক গুরুত্ব দেয় তাহলে সেখানে স্বাভাবিক কারণেই জাতীয়তাবাদী জনগণের মধ্যে অসন্তোষ চরমে পৌঁছয়। কিন্তু সামাজিক বিচ্ছিন্নতার জন্য বিকল্প শাসকগোষ্ঠীও গড়ে উঠতে পারে না। যেমন ইজিপ্ট ও ইরাকের ক্ষেত্রে হয়েছিল। এসব ক্ষেত্রে সামরিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে।

(২) অসামরিক সরকারের দ্বারা সামাজিক সমস্যার উপযুক্ত সমাধানের অক্ষমতা দীর্ঘকালীন রাজনৈতিক সংকটাবস্থার সৃষ্টি করে এবং ক্রমান্বয়ে দেশকে সামরিক শাসনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

(৩) ইয়েমেনের ন্যায় সমাজের শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবীদের অসামরিক শাসনব্যবস্থার প্রতি দীর্ঘকালীন অসন্তোষ সামরিক অভ্যুত্থানকে ত্বরান্বিত করে।

(৪) প্রশাসনিক ব্যবস্থার দুর্নীতি, সরকারী ব্যবস্থায় দুর্বলতা, বৃহত্তর জনমানসে ক্রমবর্ধিত অসন্তোষ ও সরকারী ব্যবস্থার প্রতি চরম ঔদাসীন্য, অন্যদিকে বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত এলিটদের বামপন্থীদের

ক্ষমতাবৃদ্ধি সম্পর্কে ভীতি অনেক ক্ষেত্রে সামরিক অভ্যুত্থানের পথ সুগম করে।

এছাড়াও সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে অর্ন্তকলহ সামরিক অভ্যুত্থানের পক্ষে সহায়ক।

S. E. Finer রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থা অনুসারে চার ধরনের সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করেছেন :

(ক) **সুউন্নত রাজনীতিক সংস্কৃতি,** যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সুসংবদ্ধ জনগণ ও সচেতন মনোভাব। রাজনীতিক হস্তান্তরের কোনরকম বিরুদ্ধ প্রচেষ্টা, বোধভাবে জনগণের দ্বারা প্রতিহত হয়। তাই ব্রিটেন, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড, কানাডা ইত্যাদি সুউন্নত দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে না।

(খ) **উন্নত রাজনীতিক সংস্কৃতি :** অনেকাংশে সুউন্নত সংস্কৃতির সঙ্গে সাযুজ্য সম্পন্ন। তবে ক্ষমতার হস্তান্তরণ সম্পর্কে বা এই পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণ ততটা সচেতন না থাকার ফলে এই ধরনের দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটা বিচিত্র নয়—তবে শাসন-ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব লাভ করা সামরিকবাহিনীর পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

(গ) দুর্বল, বিচ্ছিন্ন ও অবিমিশ্র সমাজব্যবস্থাই হচ্ছে **অনুন্নত রাজনীতিক সংস্কৃতির** অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এমনকি এই ধরনের দেশে সরকারের কর্তৃত্ব জনগণের কাছে সন্দেহাতীত নয়। তাই সামরিক অভ্যুত্থান এসব দেশে সহজেই ঘটতে পারে। যেমন তুরস্ক, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, পাকিস্তান ইত্যাদি। এখানে জনগণ সামরিক শাসনের আইনানুগতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেও সোচ্চার হয় না। তাই সামরিক শাসনও স্থায়িত্ব লাভ করে।

(ঘ) **পশ্চাৎমুখী রাজনীতিক সংস্কৃতি** হচ্ছে সুউন্নত রাজনীতিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই ধরনের রাষ্ট্রে যে কোন সময় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটতে পারে। এবং সামরিক অভ্যুত্থানকে প্রতিহত করার মতো সচেতনতাও এখানকার জনগণের মধ্যে থাকে না। তাই সামরিক শাসনব্যবস্থাও নিজেকে আইনানুগ

করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না। লাতিন আমেরিকার কিছু কিছু রাষ্ট্র এর উদাহরণ।

সামরিক অভ্যুত্থান ও সামাজিক প্রগতি

সামরিকবাহিনী কর্তৃক শাসন অধিগ্রহণ যে সবক্ষেত্রে সামাজিক অগ্রগতির অন্তরায় একথা মনে করার কোন কারণ নেই। কারণ সামাজিক বিশৃঙ্খলার পথ ধরেই যখন অধিকাংশ দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে, তখন এটা আশা করা যেতে পারে যে সামরিক অধিগ্রহণ উন্নতির অন্তরায়গুলোকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করবে। এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সামরিকবাহিনী সামাজিক প্রগতির পথ প্রশস্ত করে দেয়। শুধু তাই নয় অতীতের বন্ধ্যাত্বের বাঁধন থেকেও মুক্ত করে। সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটিয়ে সামাজিক ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব আনে।

লেনিন মনে করতেন যে সামরিক অভ্যুত্থানের পূর্ববর্তী সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব-পূর্ববর্তী সামাজিক অবস্থার বেশ কিছু সাদৃশ্য আছে।[২৬] বিশেষত শাসকশ্রেণীর শাসনক্ষমতা বজায় রাখার অক্ষমতা এবং ক্রমবর্ধিত গণ অসন্তোষ ও রাজনৈতিক চরম সংকটাবস্থা সামরিক অভ্যুত্থান এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বশর্ত। অবশ্য বিপ্লব-পূর্ববর্তী অবস্থার ন্যায় অভ্যুত্থানের আগের সামাজিক সংকট অতটা গভীর নাও হতে পারে, আর সেইজন্য অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সমাজে কোন ব্যাপক কাঠামোগত পরিবর্তন হয় না। শুধু শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তন হয়। সুতরাং অভ্যুত্থানের ফলে যে পরিবর্তন হয় তাকে আমরা শুধু রাজনৈতিক পরিবর্তন হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। এছাড়াও বিপ্লবের জন্য প্রাথমিকভাবে দরকার জনসমষ্টির ব্যাপক অংশের অংশগ্রহণ। মতাদর্শের দ্বারা গঠিত রাজনৈতিক দল একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের জন্য ব্যাপক জনগণকে এর সঙ্গে যুক্ত করে। কিন্তু এ-ধরনের জনসংযুক্তি সামরিক অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় না। বড়জোর অভ্যুত্থানের সমর্থন আদায় করতে পারে, কিন্তু তা কখনও সমাজ বিপ্লবে রূপান্তরিত হতে পারে না।

ইদানীং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ব্যাপক হারে সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটতে দেখা যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তার চরম সংকটাবস্থায় জাতীয়তাবাদী বা সমাজতান্ত্রিক শক্তির হাত থেকে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তৃতীয় বিশ্বে একের পর এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাচ্ছে। হয়তো

অনেক ক্ষেত্রে আপেক্ষিকভাবে সমাজের কোন কোন শ্রেণী সাময়িকভাবে একে সমর্থন করছে। কিন্তু সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে কতটা সামাজিক অগ্রগতি সম্ভবপর এই প্রশ্নে সন্দেহের যথার্থ অবকাশ আছে।

যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় সামরিক শাসকগণ কোনভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর মূল্যবোধ ও বৈপ্লবিক চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় না, বরঞ্চ শ্রমিকশ্রেণীর গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে। তবুও সোমালিয়ায় সামরিক শাসকগণ শ্রমিক ও যুবকদের ঐক্যবদ্ধ করার আন্তরিক চেষ্টা করেছিল। এমনকি তাদের ঐক্যবদ্ধ করে রাজনৈতিক আন্দোলনের পথ সুগম করে তুলেছিল। আবার পেরু, ইরাক ও আলজিরিয়ায় সামরিকবাহিনী ক্ষমতা দখলের পর আভ্যন্তরিক ক্ষেত্রে যেমন প্রগতিশীল মনোভাব গ্রহণ করেছিল, তেমনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত হতেও কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পোর্তুগালের সামরিক শাসকদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সেখানেও সামরিকবাহিনী শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে মিলিতভাবে স্যালাজারের সুদীর্ঘ ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটায়। এবং সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বছর পরও বিভিন্ন শ্রমিক সংঘ, রাজনৈতিক দল এমনকি কমিউনিস্ট দলও তাদের গণতান্ত্রিক কার্যধারা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রগতিশীল সামরিক অভ্যুত্থান তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও দেখা গেছে। প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা থেকে, বহু তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রকে সামরিকবাহিনী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মুক্ত দিয়েছে। এমনকি বহুদেশে সামরিকশাসন সাম্রাজ্যবাদী শোষণমুক্তির অন্যতম অস্ত্র হয়ে উঠেছে, যা একদিকে যেমন দেশকে অগ্রগতি ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, অন্যদিকে তেমনি শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথকেও উন্মুক্ত করেছে।

তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক সামরিক নেতাদের মধ্যে আদর্শস্থানীয়, যাঁর নেতৃত্বে তুরস্ক আর্থ-সামাজিক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করেছিল। আতাতুর্ক কঠোরভাবে সামরিক নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক নেতৃত্বের মধ্যে পার্থক্য করতেন। তাই তাঁর নিয়মানুসারে সামরিক নেতাকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করতে হলে সামরিক পদ ছাড়তে হত।

সামরিক নেতৃবর্গ ক্ষমতা দখলের পর অভ্যুত্থানের কারণ হিসাবে সাধারণত বলে থাকেন যে যদি অসামরিক কর্তৃপক্ষ শান্তিপূর্ণভাবে সমাজের

বিরোধ মেটাতে পারতেন, তাহলে সামরিক অভ্যুত্থানের কোন প্রয়োজনই হত না।

প্রসঙ্গত ইরাকের নুরী সৈয়দের উদাহরণ আমরা উল্লেখ করতে পারি। প্রায় এক দশক ধরে ইরাকের জনগণ নুরী সৈয়দের স্বেচ্ছাচারী শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। 1958 সালে সামরিকবাহিনীর কিছু প্রগতিশীল সভ্যের সহায়তায় সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নুরী সৈয়দকে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভবপর হয়। সেই সামরিক অভ্যুত্থানের প্রধান নায়ক জেনারেল কাসেম পরে উল্লেখ করেন যে, সামরিকবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহায়তা ভিন্ন নুরী সৈয়দকে ক্ষমতাচ্যুত করা যেত না। এবং আহমেদ বাকিরের বর্ণনা অনুযায়ী (*How Iraq Unity Was Brought About* World News, 26th July 1958)[**] ইরাকের জনগণও সামরিকবাহিনীর সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করেছিল। জনগণ ও সামরিকবাহিনীর যৌথ শক্তিই ইরাকের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছিল।

সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে সামরিক অভ্যুত্থানের নেতাগণ তাদের অভ্যুত্থানকে পরিবর্তনের সহায়ক হিসাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। যদিও অনেকে মনে করেন যে অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক বিপ্লবকে ঠেকানোর জন্য সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের প্রবণতা দেখা যায়। তবে যে গণ অসন্তোষ ও শ্রেণীগত বিরোধ বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে, সেইরূপ সামাজিক অবস্থাই অনেক সময় সামরিক অভ্যুত্থানের পথ সুগম করে, কিন্তু এর ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে না।

বৃহত্তর জন-সমর্থন ও গণ-অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিপ্লব সংঘটিত হয়, কিন্তু সামরিক অভ্যুত্থানে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাপক সংখ্যায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের প্রবণতা থাকলেও মূলত সামরিকবাহিনীর উচ্চস্তরেই এই অভ্যুত্থান সীমাবদ্ধ থাকে।

তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশ ইদানীং সামরিকশাসনের আওতাভুক্ত এবং এই সমস্ত দেশে ঐতিহাসিক পরিবর্তনও অনেক সময় সামরিক নেতৃত্বে ঘটে, ফলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে কঠোরভাবে দমন করার চেষ্টাও করা হয়। কারণ তাদের শ্রেণীগত অবস্থানই তাদেরকে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পরিপন্থী করে তোলে। অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পর বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন বা বৈপ্লবিক অগ্রগমন অপেক্ষা সামরিক নেতারা তড়িৎ পরিবর্তনের দিকে বেশী নজর দেন। এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা ক্ষমতা

দখলের পরে উপযুক্ত অসামরিক শাসক হয়ে উঠতে পারেন না, অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে সামরিকবাহিনীর পেশাসুলভ মনোভাব থেকেই যায়।

মূল্যায়ন

বর্তমান পৃথিবীতে উন্নত বা অনুন্নত সকল দেশেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা-সংক্রান্ত ধারণার অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে সামরিকবাহিনীর অস্তিত্ব। যদি এমন কোন অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের কথা জানা থাকত, যেখানে সামরিকবাহিনী নেই, তাহলে একদিকে যেমন সামরিক অভ্যুত্থানের সমস্যা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত অন্যদিকে তেমনি যুদ্ধের আশঙ্কায় ত্রস্ত পৃথিবীতে শান্তির এলাকা বলে কিছু জায়গাকে অন্তত চিহ্নিত করা যেত। কিন্তু এ শুধু অলীক কল্পনা। কোন নেতাই আজ জোরের সঙ্গে ঘোষণা করতে পারেন না যে 'আমাদের দেশে কোন সামরিকবাহিনী থাকবে না।' এমন কি টোগোর মত ক্ষুদ্রতম দেশেও 200 সদস্য বিশিষ্ট সামরিকবাহিনী গঠন করা হয়েছিল। এবং তারাই পরবর্তীকালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে।[28] সামরিকবাহিনী গঠনের মূল যুক্তি হচ্ছে দেশের সার্বভৌমতা রক্ষা করা, অর্থাৎ বিদেশী রাষ্ট্রের আক্রমণের হাত থেকে জাতীয় রাষ্ট্রের স্থায়িত্বকে নিশ্চিত করা। কিন্তু আজ যদি সামরিকবাহিনীর অস্তিত্বের অবলুপ্তি ঘটানো যায় তাহলে জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমতা রক্ষার সমস্যাও থাকবে না। এবং সার্বভৌমতা রক্ষার প্রতীক অস্বীকৃত উপায়ে ক্ষমতা দখল করে নিতে পারে, এ আশঙ্কা থেকেও পৃথিবী মুক্ত হবে। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক গোলযোগের মোকাবিলা করার জন্য বিচ্ছিন্ন আধা-সামরিকবাহিনী থাকবে, আর থাকবে রাষ্ট্রমধ্যস্থ চেতনাসম্পন্ন জনসমর্থনের প্রাবল্য। অবশ্য এক্ষেত্রে আধা-সামরিকবাহিনী বা পুলিস যে ক্ষমতা দখলে সচেষ্ট হয়ে উঠবে না, এ নিশ্চয়তা নেই।

যে কারণেই হোক বিংশ শতাব্দীর শেষাংশে এসে শান্তির কথা মুখে বললেও পৃথিবীর কোন দেশই সামরিকবাহিনীর গুরুত্ব হ্রাস করতে পারেনি। উপরন্তু ক্রমাগত বিভিন্নভাবে তার গুরুত্বকে বাড়িয়ে তুলছে। এবং সামরিকবাহিনীকে শান্তির রক্ষক বলে বর্ণনা করার প্রবণতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ শুধু অনুন্নত দেশেই নয়, উন্নত দেশের ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। অনুন্নত দেশ তার আভ্যন্তরিক দুর্বলতা বিদেশী রাষ্ট্রের আক্রমণ থেকে সার্বভৌমতা রক্ষা এবং সামাজিক শ্রেণীদ্বন্দ্বকে নিয়ন্ত্রণ

করার জন্য সামরিকবাহিনীর ওপর নির্ভরশীল। শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গড়ে তোলা হয়েছিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, যার মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল 'ভাবীকালের মানুষকে যুদ্ধের অভিশাপ থেকে রক্ষা করা।' তারপর হয়তো বিশ্বযুদ্ধ আর হয়নি, তবুও মানুষ প্রত্যেক রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে আর একটি বিশ্বযুদ্ধের— যা তাদের সমুদয় অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। তাই এখন প্রত্যেক প্রভাতের নতুন চিন্তা, সামরিকবাহিনীকে কিভাবে আরো শক্তিশালী করে তোলা যায়, যাতে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভবপর হবে। নয়া উপনিবেশবাদ আজ নগ্ন নির্লজ্জ হুঙ্কার ছাড়ছে, সামরিকবাদই আজ তাদের উদ্ধত বার্তা জ্ঞাপন করার অন্যতম সহায়ক। এই পৃথিবীতে সামরিক-বাহিনীর অবলুপ্তির কল্পনা তাই নিশ্চিতভাবে পাগলের প্রলাপ। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যুদ্ধের সম্ভাবনাকে কমায়নি, উপরন্তু এমন এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করতে পরোক্ষ সহায়তা করছে, যখন প্রতিটি রাষ্ট্র আরও বেশী করে সামরিকবাহিনীর অস্তিত্বের অনিবার্যতা উপলব্ধি করছে।

সামরিকবাহিনীর পরিবর্তে শক্তিশালী আধা-সামরিকবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা যে সম্পূর্ণভাবে বিপদমুক্ত একথা মনে করারও কোন কারণ নেই। শক্তিশালী আধা-সামরিকবাহিনীও রাষ্ট্রের দুর্বলতার সুযোগে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে পারে। একমাত্র সচেতন জনমত ও জনপ্রতিরোধই সামরিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনাকে প্রতিহত করতে পারে। মনে রাখতে হবে, সামরিকবাহিনীই হল একমাত্র গোষ্ঠী, যাকে জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রাচীনপন্থী গণতন্ত্রের তাত্ত্বিকগণ নিরপেক্ষ সামরিকবাহিনী গঠন করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অভ্যুত্থানের সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এবং সামরিকবাহিনীকে রাষ্ট্রশক্তির সহায়ক বা বিরোধী বিভিন্ন সামাজিক গ্রুপ থেকে নিরপেক্ষ শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে সামরিকবাহিনীর কার্যকারিতা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের আওতাভুক্ত করে রাখতে চেয়েছিলেন। আধুনিক কালেও আমরা যে এরকম 'আদর্শ ব্যবস্থা' কল্পনা করি না, তা নয়, তবে পরিবর্তিত অবস্থায় সামরিকবাহিনীকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ শক্তি ভাবা সম্ভবপর নয়। তাই সামরিকবাহিনীর মধ্যেও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে তাকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনুবর্তী করার নতুন প্রচেষ্টা চলছে। অবশ্য এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল

শক্তিশালী রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। কিন্তু অনুন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে এইরকম শক্তিশালী রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। বিভিন্ন ক্ষুদ্র বৃহৎ শ্রেণীর ভিন্নমুখীন দ্বন্দ্ব সেখানে রাষ্ট্রশক্তিকে দুর্বল করে দেয়। অবশ্য এ সমস্যা একদিক থেকে উন্নত দেশে অনুপস্থিত। অনুন্নত দেশে রাজনীতিক কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ কয়েকটি গোষ্ঠীর মধ্যে। সাধারণ মানুষের চেতনার স্তর এমনই নীচু যে অতি সহজেই সামগ্রিকতামূলক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সহজ হয়ে ওঠে। রাজনীতিক ব্যবস্থার সঙ্গে উপযুক্ত যোগাযোগের অভাবের জন্য নীচের তলার মানুষের স্বার্থ অবহেলিত থাকে। পরিবর্তে অংশবিশেষের স্বার্থ অত্যধিক প্রাধান্য লাভ করে। অন্যদিকে বৃহত্তর জনগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সামরিকবাহিনীর প্রত্যক্ষ গুরুত্বকে অত্যধিক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে সামরিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনাও বেড়ে যায়।

সামরিক ও অসামরিকগোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সামরিকবাহিনী একমাত্র ভাড়াটে সৈনিকদের ক্ষেত্রেই সম্ভবপর। বরঞ্চ উদারনীতিক গণতান্ত্রিক দেশসমূহে গণতন্ত্র বিপন্ন এই অজুহাতে অত্যধিক ক্ষেত্রে সামরিক সহায়তা গ্রহণ করা হয়। এমনকি রাজনীতিক ব্যাপারে সামরিকবাহিনীর নিরপেক্ষতা রাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষতা প্রমাণের অন্যতম হাতিয়ার। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সামরিক-বাহিনীকে জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও গণতন্ত্র রক্ষার অন্যতম সহায়ক শক্তি হিসাবে ব্যবহার করছে। ফলে দেখা যাচ্ছে অনেক অনুন্নত দেশে সামরিকবাহিনী গণতন্ত্র ও নিরাপত্তা রক্ষার অজুহাতে রাজনীতিক ক্ষমতা দখল করছে।

সুতরাং গণতন্ত্র নামক সামাজিক-রাজনীতিক মূল্যবোধ রক্ষার সহায়ক শক্তি হিসাবে যাকে ব্যবহার করা হবে, সেই শক্তিটি যে কোনরকম রাজনীতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকবে এরূপ কল্পনা করা নিরর্থক। তাই আশা করা হয় যে সামরিকবাহিনী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন থাকলেও তাতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকবে। এর প্রকৃত অর্থ দুটি: প্রথমত সামরিক সদস্যরা কঠোরভাবে পেশাদারী মনোভাবাপন্ন হবে এবং দ্বিতীয়ত সামরিকবাহিনীকে একটি নিরপেক্ষ শক্তি হিসাবে শাসকবর্গ যতদিন তাদের স্থায়িত্ব রক্ষার কাজে ব্যবহার করতে

পারবে, ততদিন সামরিক অভ্যুত্থানকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে। একইভাবে সামাজিক ক্ষেত্রেও যতদিন সামরিকবাহিনীর এই নিরপেক্ষ অথচ গণতন্ত্ররক্ষাকারী ভাবমূর্তি বজায় থাকবে, ততদিন সামরিকবাহিনীও জন-সমর্থনের অভাবে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলে সাহস করবে না।

এই ধরনের মূল্যবোধের ফলেই আধুনিক পৃথিবীতে সামরিকবাহিনী ক্রমাগত আভ্যন্তরিক নীতিনির্ধারণে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করে চলেছে। তাহলে কি ধরে নেওয়া যায় যে সামাজিক মূল্যবোধের বাস্তবায়নের জন্য সামরিকবাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ অত্যন্ত জরুরী? এরকম বলা হয়ে থাকে যে অনুন্নত দেশে আধুনিক মনন ও প্রশিক্ষণে শিক্ষিত গোষ্ঠী হচ্ছে সামরিকবাহিনী। তাই আধুনিকতা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে সামরিকবাহিনীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ছে। অনুন্নত দেশের গণতন্ত্রকে Edward Shils প্রমুখ গবেষকগণ মূলত 'অভিভাবকের গণতন্ত্র' হিসাবে অভিহিত করেছেন, যেখানে একটি বিশেষ উন্নত গোষ্ঠীর অভিভাবকত্বই একমাত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ সম্ভবপর বলে মনে করা হয়েছে। আমরা যদি অনুন্নত দেশের পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই দুটি ধারণাকে পাশাপাশি রাখি তাহলে সামরিকবাহিনীর রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলকে একটি স্বাভাবিক ঘটনা বলে মেনে নিতে বাধ্য হব। কারণ Lucian W. Pye-এর মতানুসারে অনুন্নত দেশে সামরিকবাহিনী সর্বাপেক্ষা আধুনিক ও শৃঙ্খলাবদ্ধ গোষ্ঠী। কিন্তু সামরিক শাসনে কোন দেশ সুউন্নত হয়েছে এরকম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের আছে কিনা সন্দেহ। সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি হচ্ছে এমন একটি বিশেষ মূল্যবোধ, যা একমাত্র সামাজিক চেতনার উন্মেষের দ্বারাই অর্জন করা সম্ভবপর। উপরিকাঠামোয় আরোপিত উন্নতি সমাজের শেকড়ের গোড়ায় রস সঞ্চার করতে পারে না। সুতরাং উন্নতির দুর্বলতার অজুহাতে সামরিক অভ্যুত্থানের কারণ ব্যাখ্যা করার প্রয়াস সরলীকরণ প্রক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নয়। বরঞ্চ সামরিকবাহিনীকে বিচ্ছিন্ন ব্যারাকবন্দী শক্তি না করে রেখে, তার উন্মুক্ত ও সচেতন সহায়তা গ্রহণের আন্তরিক চেষ্টা একদিকে যেমন সামাজিক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করবে, অন্যদিকে তেমনি অভ্যুত্থানের সম্ভাবনাকেও দূর করবে। অপরপক্ষে সামরিকবাহিনীকে যতবেশী বিচ্ছিন্ন করে রাখা হবে ততবেশী প্রতিযোগী গোষ্ঠী হিসাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের অভীপ্সা তার মধ্যে দিন দিন বৃদ্ধি পাবে।

বিশ্লেষণ

তাই বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে অনুন্নত ও নব স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে সামরিকবাহিনীর ভূমিকার নতুন মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রচলিত ধারায় তাকে যখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ব্যারাকবন্দী গোষ্ঠী হিসাবে সরিয়ে রাখা সম্ভবপর নয়, এবং যখন সামরিকবাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতাদখলের প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন নতুনভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে দেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার ফলস্বরূপই হোক কিংবা অন্য কোন কারণের জন্যই হোক নতুন রাষ্ট্রগুলোতে সামরিকবাহিনীর সদস্যরা রাজনীতির ব্যাপারে অনেক বেশী সচেতন। তবু তাদের এই রাজনৈতিক সচেতনতা বহুলাংশে জাতীয়তাবাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ। তাদের এই জাতীয়তাবাদী চেতনা দেশগঠনের কাজে অন্যতম শক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। অবশ্য এই চেতনাকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগানোর জন্য চাই শক্তিশালী সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা। এবং এমন এক নেতৃত্ব যা বিভিন্ন শক্তিকে এই মতাদর্শের ভিত্তিতে একমুখীন করে তুলতে পারবে। অস্বীকার করার উপায় নেই, এই নেতৃত্বের অভাবই বিভিন্ন দেশে সামরিক অভ্যুত্থানকে ত্বরান্বিত করছে।

বাম-মনোভাবাপন্ন চিন্তাবিদগণ মনে করেন বিপ্লবের ক্ষেত্রে সামরিক-বাহিনীই হচ্ছে প্রধানতম শত্রু। কিন্তু একথা মনে করা যে ভিত্তিহীন, সে আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি। বরঞ্চ শক্তি হিসাবে সামরিকবাহিনী আধুনিক ও সুগঠিত। অতএব এই শক্তিকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে ও পরবর্তীকালে সমাজগঠনে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারলে তা অবশ্যই ফলপ্রসূ হবে।

'সামরিক অভ্যুত্থান কিভাবে বন্ধ করা যায়?' এই প্রশ্নে গবেষক মহল আজ বিশেষভাবে আন্দোলিত। এর মৌলিক অর্থই হচ্ছে সামরিকবাহিনী একটি বিচ্ছিন্ন ও শক্তিশালী গোষ্ঠী, তাই তাকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। পরিবর্তে আমরা যদি নতুন পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিকতায় সচেতন ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ এই শক্তিশালী গোষ্ঠীকে সমাজ পরিবর্তনে কিভাবে ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে চিন্তা করি তাহলে সে চিন্তা হবে অনেক বেশী গঠনাত্মক। 'সামরিকবাহিনীর সদস্যগণও রাজনৈতিক ব্যাপারে এবং তাদের শ্রেণীগত অবস্থান সম্পর্কে সচেতন' —এইরূপ ধারণা উদারনৈতিক গণতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকদের কাছে বিপ্লবী মতবাদ হিসাবে মনে হলেও, পরোক্ষে তাঁরাও একথাটাকে অস্বীকার করতে পারেন না। তাই আজ

অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে যে শক্তি পেণ্টাগনের রাজনৈতিক নির্দেশে আধুনিকতম, সুউন্নত সমরাস্ত্র ব্যবহারে এত দক্ষতা প্রদর্শন করতে সমর্থ, সেই শক্তিকে সমাজগঠনের কাজে বিচ্ছিন্ন করে রাখার চেষ্টা শুধুই বৃহৎশক্তির তাঁবেদারির জন্য করা হচ্ছে, এরকম চিন্তা করলে কি ভুল হবে ?

কোন দেশেই সামরিকবাহিনী আগেভাগেই ক্ষমতা দখল করে না। — বিশেষ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা তাকে সেইদিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অতএব প্রথম থেকেই সামরিকবাহিনীকে একটি বিরোধী শক্তি হিসাবে ভেবে নেওয়া, পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থারই দুর্বলতার প্রমাণ।

তাই সামরিক অভ্যুত্থানের বিভীষিকা থেকে মুক্ত এক নিরুদ্বেগ রাষ্ট্রশক্তির কথা ভাবতে গেলে সামরিক শক্তি সম্পর্কে আমাদের পূর্ব ধারণার মৌলিক রদবদল একান্ত দরকার। এ বিষয়ে অন্য কোন বিকল্প নেই।

উপসংহার

Lucian W. Pye ঐতিহাসিক ধারার পরিপ্রেক্ষিতে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রধানত তিন প্রকারের সামরিক-অসামরিক সম্পর্কের কথা বলেছেন।[৩৭] প্রথমত, মধ্যপ্রাচ্যের কিছু কিছু রাষ্ট্রে, যেখানে শিল্পোন্নত দেশের অনুকরণে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠলেও, সামরিকবাহিনীই একমাত্র সংগঠিত ও শক্তিশালী গোষ্ঠী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার অন্যতম দাবিদার। দ্বিতীয়ত, বেলজিআমের ন্যায় কোন কোন দেশে সামরিকবাহিনীই পরোক্ষভাবে অসামরিক কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অসামরিকগোষ্ঠী আর্থ-সামাজিক উন্নতির চেষ্টা করে। তৃতীয়ত, অধিকাংশ অনুন্নত দেশে দেখা যায়, গণতান্ত্রিক শাসনকাঠামো প্রতিষ্ঠিত থাকলেও শাসকগোষ্ঠীর দুর্বলতার জন্যই তা কার্যকর হতে পারে না। ফলে উন্নতির ধারা ব্যাহত হয়, এই সমস্ত দেশে সমাজের অধিকাংশ মানুষ সামরিকবাহিনীকে ত্রাণকর্তা বলে মনে করেন।

অস্বীকার করার উপায় নেই, এধরনের প্রতিরূপ নির্ধারণ অনুন্নত দেশে সামরিক অভ্যুত্থানের প্রবণতার কারণ নির্ণয়ে সহায়ক, তাই এর গুরুত্বও আছে। তবে সবক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় দুর্বলতার ওপর অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা সামরিকবাহিনীর সামাজিক ভূমিকার উপযুক্ত মূল্যায়ন ও ব্যবহারের পথনির্ণয় থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে রেখেছে। সামরিকবাহিনী

আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীন সামাজিক শক্তি হিসাবে দেখা দিলেও এর শ্রেণীচরিত্র গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের বিশেষ এক শ্রেণীকে ক্ষমতাসীন রাখার যন্ত্র হিসাবে একে দেখা যেতে পারে। যাকে সামরিক অভ্যুত্থান বলে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে, আসলে তা একটি বিশেষ শক্তিগোষ্ঠীর ক্ষমতায় থাকার একটি বিশেষ ধরন মাত্র। সামরিক অভ্যুত্থানকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেও আমরা দেখতে পারি। অর্থাৎ, সামরিকবাহিনীকে শাসকশ্রেণীর সহায়কগোষ্ঠী হিসাবে সমাজের দ্বন্দ্ব ও বিরোধ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে, যাতে শাসকশ্রেণী তার সঙ্কটাবস্থায় অতি সহজেই এই আপাতনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর সাহায্য গ্রহণ করতে পারে। এমনকি অবস্থাবিশেষে কয়েকজনকে দিয়ে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে শাসকগোষ্ঠীর বাহ্যিক পরিবর্তন করা যেতে পারে—যদিও এর দ্বারা রাষ্ট্রব্যবস্থা বা শ্রেণীবিরোধের কোন পরিবর্তন হয় না।

সামরিকবাহিনী ও তার ভূমিকা নিয়ে আলোচনার ধারাকে আমরা মোটামুটিভাবে চারটি পৃথক্ দৃষ্টিভঙ্গীতে ভাগ করতে পারি।

উদারনৈতিক বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে সামরিকবাহিনী একটি নিরপেক্ষ গোষ্ঠী, যার মূল উদ্দেশ্য একদিকে সামাজিক রাষ্ট্রীয় স্থায়িত্বকে রক্ষা করা অন্যদিকে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে রাষ্ট্রশক্তির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা। সামরিকবাহিনীর স্বাধীন ভূমিকা গ্রহণ বিশেষ ব্যতিক্রম বলে উদারনৈতিক মতবাদের লেখকগণ মনে করেন। সমাজের অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে সামরিকবাহিনীর একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। বিশেষত সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে সামরিকবাহিনী সর্বাপেক্ষা সুশৃঙ্খলিত ও সুগঠিত গোষ্ঠী। এমন এক বিশেষ মূল্যবোধের সামরিক কাঠামোর মধ্যে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে পরিচালনা করা হয় যাতে করে একদিকে তাদের মধ্যে পেশাদারী মনোভাব ও অন্যদিকে সার্বভৌমত্ব রক্ষার অগ্রণী বাহিনীসূচক মনোভাব বৃদ্ধি পায়। Janowitz প্রমুখ লেখকগণ সামরিকবাহিনী গঠনে একদিকে যেমন সামরিক সদস্যদের সামাজিক প্রেক্ষাপটের ওপর জোর দিয়েছেন অন্যদিকে তেমনি তাদের পেশাগত দক্ষতা বাড়ানোর বিভিন্ন সম্ভাব্য উপায় নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সামরিক অভ্যুত্থানের কারণ হিসাবে রাষ্ট্রীয় দুর্বলতা ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বিশেষত উদারনৈতিক মতবাদ অনুসারে, যে-সমস্ত জাতীয় রাষ্ট্রে সমাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ব্যাপক প্রসারলাভ ঘটেছে সেখানে সামরিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অনেক কম বলে মনে করা হয়।

পঁয়তাল্লিশ

এ-সব রাষ্ট্রে সামরিকবাহিনীর গুরুত্ব বিশেষভাবে বোঝা যায় বৈদেশিক নীতি-সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং প্রতিরক্ষা-সংক্রান্ত সমস্যায়।

দ্বিতীয়ত অনেকে সামরিকবাহিনীর অভ্যুত্থান বা রাজনীতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক অপেক্ষা সামরিকবাহিনীর গঠন, তার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত এবং শাসকশ্রেণী ও বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন। সামরিকবাহিনীর গঠন ও কার্যপদ্ধতি অনুসরণে এই অভিজ্ঞতামূলক বিবরণ প্রক্রিয়া এক অর্থে সামরিক অভ্যুত্থানের কারণ নির্ণয়ে আমাদের খুব একটা সাহায্য করে না। তবে আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করে বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রে সামরিকবাহিনীর সদস্যদের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলক আলোচনার সম্ভাব্য সূত্রপাত করতে পারি। এবং বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে সামরিকবাহিনীর সম্পর্কও এর দ্বারা বোঝা যায়। আলোচনার এই দৃষ্টিভঙ্গীটি মূলত আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদী লেখকদের অবদান। মূল্যবোধ নিরপেক্ষ সামরিকবাহিনীর গঠনবৈচিত্র্য একদিক থেকে সামরিকবাহিনীর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে আমাদের সাহায্য করে। অভিজ্ঞতাবাদীদের মতানুসারে ইদানীং (গত দশ বছরের মধ্যে) বিভিন্ন ঘটনা অনুসরণ করে দেখা যাচ্ছে, ক্রমেই বিভিন্ন দেশে সামরিকবাহিনী আরও বেশী করে তাদের প্রভাব রাজনীতিক ব্যবস্থায় খাটাতে চেষ্টা করছে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে অসামরিক শাসকগোষ্ঠী সামরিক সচিবদের সঙ্গে একটা আপোষিক সমঝোতার মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে। আর যেখানে এ দুটোই কার্যকরী হয় না, সেখানে সামরিকবাহিনী সরাসরি ক্ষমতা দখল করে নেয়। অভিজ্ঞতাবাদীদের মতানুসারে, উক্ত বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থা অনুযায়ী সামরিকবাহিনী নিজেদের সংগঠনের পুনর্বিন্যাস করে। সুতরাং এই পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাসের ধারাকে অনুসরণ করাই গবেষণার মূলকেন্দ্র বিন্দু হওয়া উচিত। কারণ এরই মাধ্যমে সামরিক অভ্যুত্থানকে অনুধাবন করা সম্ভবপর।

তৃতীয়ত, অপর এক শ্রেণীর চিন্তাবিদ্‌ আছেন যাঁরা মনে করেন তৃতীয় বিশ্বে ও অনুন্নত দেশসমূহে সামরিক অভ্যুত্থানের প্রধান কারণ, অনুন্নত রাষ্ট্রসমূহের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে বৃহৎ শক্তির অত্যধিক হস্তক্ষেপের প্রবণতা। তাছাড়া তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের জন্য বৃহৎ শক্তিগুলি এসব জায়গায় তাদের সামরিক ঘাঁটি তৈরি করে চলেছে। এর ফলে সে-সব দেশে সামাজিক-রাজনীতিক ভারসাম্য বিনষ্ট

হচ্ছে। বৃহৎ শক্তির উপর অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের নির্ভরশীলতা তাদের স্বাভাবিক অগ্রগতি ও উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ। অন্যদিকে বৃহৎ শক্তিসমূহ তাদের নিজেদের স্বার্থে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র সরবরাহ করে চলেছে। এর ফলে এই সমস্ত দেশে আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত সামরিকবাহিনীর মধ্যে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠছে। সমাজের অসম বিকাশের জন্য সামরিকবাহিনীর পক্ষে ক্ষমতা দখল করাও অতি সহজ ব্যাপার হয়ে উঠছে।

এর বাইরে চতুর্থ একটা দৃষ্টিভঙ্গী আছে, যার বিশ্লেষণ পদ্ধতি উপরের তিনটি বিশ্লেষণ পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই পদ্ধতি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে সামরিকবাহিনীর ভূমিকা অনুধাবনের চেষ্টা করে। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে সামরিকবাহিনী কোন সমাজবিচ্ছিন্ন পরিকাঠামো নয়, বরঞ্চ সামরিকবাহিনী বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশ হিসাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সতত পরিবর্তন প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে তার সঙ্গে যুক্ত থাকে। অতএব সামরিকবাহিনীর ভূমিকা বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। শাসকশ্রেণী শাসন-ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সামরিকবাহিনীকে তার অন্যতম সহায়ক শক্তি হিসাবে ব্যবহার করে, এবং তার অস্তিত্বের চরমতম সঙ্কট মুহূর্তে সামরিকবাহিনীর সাহায্যে তার শাসনক্ষমতা বজায় রাখার চেষ্টা করে। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে সামরিকবাহিনী শ্রেণীনিরপেক্ষ শক্তি নয়। সামরিকবাহিনী হল শাসক শ্রেণীর দ্বারা গঠিত এমন একটি শক্তিগোষ্ঠী যা শাসকশ্রেণীকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার ক্ষমতা জীইয়ে রাখতে সাহায্য করে। এবং কোন বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অভ্যুত্থান সংঘটিত করে একদিকে শাসকশ্রেণীকে সঙ্কটাবস্থা থেকে মুক্ত করে, অন্যদিকে ভিন্নভাবে তাকে ক্ষমতায় টিকে থাকতে সাহায্য করে। অতএব সামরিকবাহিনীকে শ্রেণীনিরপেক্ষ শক্তি হিসাবে দেখা, ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। সবসময় শাসকশ্রেণী চেষ্টা করে সামরিকবাহিনীকে নিরপেক্ষতার আবরণে ঢেকে রাখতে। মূলত বাহ্যিকভাবে সামরিকবাহিনীকে সমাজবিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী হিসাবে সরিয়ে রাখা এই কৌশলেরই একটা অঙ্গবিশেষ।

মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে, সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম যত তীব্র আকার ধারণ করে, ততই সাধারণ মানুষের সংগঠন আরও বিস্তৃতি লাভ করে, এবং

গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। একদিকে শাসকগোষ্ঠী তাদের অনুকূল শক্তিকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সম্বদ্ধ করে প্রবল বিক্রমে বিরোধী শক্তিকে দমন করার শেষ চেষ্টা করে, এবং এই সময় সামরিকবাহিনীর মধ্যে একশ্রেণীর সচিব প্রত্যক্ষভাবে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে শাসকগোষ্ঠীর দমনকার্যে সহায়ক শক্তিরূপে সক্রিয় হয়ে ওঠে, অথবা অবস্থাবিশেষে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে বিরোধীশক্তিকে নির্মমভাবে নির্মূল করতে চেষ্টা করে। অন্যদিকে অপর একটা গোষ্ঠী সামরিকবাহিনীর মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বৃহত্তর সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে সমাজের মৌলিক পরিবর্তনের সময়ে সামরিকবাহিনীর মধ্যস্থ শ্রেণীবিরোধ এক কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে।[১০]

সূত্র

১. বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : Lucian W. Pye, 'Armies in the Process of Political Modernization,' in Jason L. Finkle and Richard W. Gable (ed.), *Political Development and Social Change*, John Wiley & Sons 1971, pp. 277-83.

২. ibid., pp. 280-1.

৩. Joseph La Palambara, *Politics within Nations*, Princeton Hall, 1974, p. 395.

৪. Fred R. Vonder Mehden, *The Politics of the Developing Nations*, Englewood Cliff. N. J. 1969, pp. 92-5.

৫. Morris Janowitz, *Military Institution and Coercion in the Developing Nations*, The University of Chicago Press, 1977, pp. 9-22.

৬. S. P. Huntington, 'Civilian Control of The Military : A Theoretical Statement,' in Heinz Eulau & Others (ed.), *Political Behaviour*, Amerind Publishing Co., 1956, pp. 380-5.

৭. Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press, New Haven, 1968.

৮. Bengt Abrahamsson, *Military Professionalism and Political Power*, Sage Publication, Beverly Hills, Calif., 1972.

৯. Morris Janowitz, op. cit., p. 22-6.

১০. ibid., p. 22.

১১. ibid., pp. 23-6.

১২. ibid., p. 23.

১৩. ibid.

১৪. Lucian W. Pye, op. cit.

১৫. S. P. Huntington, 'Civilian Control of the Military...', op. cit.

১৬. Morris Janowitz, *The Military in the Political Development of New Nations*. The University of Chicago Press, pp. 1-8.

১৭. Hons Speier, *War and the Social Order : Papers in Political Sociology*, G. W. Stewart, New York, 1952.

১৮. S. E. Finer, *The Man on The Horse Back*, Pall-Mall Press, London, 1962, p. 81.

১৯. S. P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, op. cit.

২০. J. Von Doorn (ed.), *Military Profession and Military Base*, Mouton, The Hague, 1969.

২১. Jack Woddis, *Armies and Politics*, Lawrence and Wishart, London, 1977.

২২. ibid., p. 16.

২৩. ibid., p. 19.

২৪. ibid., p. 22.

২৫. ibid., p. 38.

২৬. Engels, 'The Origin of The Family, Private Property and The State,' in Marx and Engels, *Selected Works*, Moscow, 1949.

২৭. Jack Woddis, op. cit., p. 39.

২৮. ibid. pp. 41-7.

২৯. ibid., p. 42.

৩০. S. P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, Feffer & Simon, Inc. NY., 1975 pp. 105-17.

৩১. J. C. Johari, *Comparative Politics*, Sterling Publishers, Delhi, 1976 p. 467.

৩২. S. P. Huntington, op. cit., pp. 132-47.

৩৩. Quoted in Jack Woddis, op. cit., p. 66.

৩৪. ibid.

৩৫. ibid.

৩৬. ibid., p. 75.

৩৭. ibid., p. 71.

৩৮. Morris Janowitz, *The Military and The Political Development of New Nations.*, op. cit., p. 100.

৩৯. Lucian W. Pye, op. cit., p. 283.

৪০. Jack Woddis : op. cit., pp. 298-300.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ-এর

অন্যান্য প্রকাশিত পুস্তিকা

আর্নেস্ট মাণ্ডেল : মার্ক্সীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব / চার টাকা

ইকবাল নারায়ণ   পি সি মাথুর
চন্দ্রপ্রকাশ ভামরি : ভারতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা / সাড়ে তিন টাকা